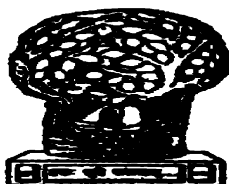
আকবর

লেখক
লরেন্‌স্ বিনিয়ান্

অনুবাদক :
শিশিরকুমার দাস



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ভারতবর্ষ
নূতন দিল্লী

মার্চ ১৯৫৯ (ফাল্গুন ১৮৮৯)

AKBAR

by

LAWRENCE BINYON

(*Bengali*)

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সেক্রেটারির দ্বারা প্রকাশিত, ভারতবর্ষ, নিউ দিল্লী-১৩। মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

ভারতপ্রেমিক
উইলিয়াম্ রোথেনস্টাইন-কে
পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতিস্বরূপ

১

যশোলক্ষ্মীর মাল্য সর্বদাই যোগ্যকণ্ঠে অর্পিত হয় না, তবুও সাধারণ মানুষ ভাগ্যদেবতার প্রিয়পাত্রদের প্রতি স্বভাবতই মুগ্ধ। কাল ও স্থানের দূরত্বে তাঁহাদের আরও বড় মনে হয়, ক্ষণজন্মা মনুষ্যগুলির চারিদিকে একটি কাহিনীর পরিমণ্ডল রচিত হয়। কখনও কখনও তাঁহারা নিজেদের মোহিনীশক্তির সম্বন্ধে সচেতন ; পৃথিবীর মুগ্ধতার সহিত সেই সচেতনতা মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে উপকথার সৃষ্টি করে। যখন একজন মানুষ সংসারের কল্পনাশক্তির দ্বারা নূতনভাবে রচিত হয় তখন তাঁহার সত্যমূর্তি আবিষ্কার করিবার জন্য যুক্তিবাদীর প্রচেষ্টা বৃথা। নেপোলিয়ানের বহু ক্ষুদ্রতা ও হীনতার কথা কতসময়েই জানা গিয়াছে, কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও তিনি এক কালজয়ী বিশাল পুরুষে পরিণত হইয়াছেন।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয়ী ও শাসক আকবরের জীবনে এমন একটা কিছু আছে যাহা মানুষের রচিত কিংবদন্তীর জগৎ-কে স্বতঃই অস্বীকার করে। একথা অবশ্য সত্য যে ঐতিহাসিকগণ কর্তব্যবোধেই তাঁহার চারিপার্শ্বে অতিমানবের মহিমার পরিমণ্ডল রচনা করার সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণত্বের অনেক পূর্বলক্ষণই দেখা দিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। যেমন তিনি নাকি তাঁহার সাতমাস বয়সেই দোলনায় শায়িত অবস্থায় অতি মার্জিত ভাষণ দিয়াছিলেন। কিন্তু এইসব কল্পিত মহিমার কাহিনী বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তিনি যেন অধৈর্যে এই সকল কল্পিত মহিমার বন্ধন দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বলি না যে, তাঁহার যশের প্রতি কোন তৃষ্ণা ছিল না ; বরং যথেষ্টই

ছিল। কিন্তু জীবনে যশ যে তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন তাহা বুঝিতেন।

আকবর বাবরের পৌত্র। বাবর ছিলেন আনন্দময়, রোমাঞ্চ-প্রিয়। তিনি মধ্যএশিয়ার একটি অতি ক্ষুদ্র, মনোরম রাজ্যের সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। বৃহত্তর রাজ্য-লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়া ও পরিকল্পনা করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, অবশেষে তিনি হিন্দুস্থানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য জয় করিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন প্রায় দৈবাধীনভাবে সেই সাম্রাজ্য কিছুকালের জন্য পাইয়াছিলেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী আফগানরাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইলেন। তাহাব পর বহুবর্ষের নির্বাসনের পর রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন আকবর বালকমাত্র। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি সংগ্রামে জয়ী হইলেন, রাজ্যরক্ষা করিলেন, তাহার পরে প্রায় অনিঃশেষ যুদ্ধের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রাজ্যের পর রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইতে আসমুদ্র হিমাচল তাঁহার করতলগত হইল। দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া দিলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভু।

বিজয়ী হিসাবে ইহা তাঁহার বিরাট কৃতিত্ব। আর শাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব হইল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সকল কিছুকেই একটি ঐক্যের বাঁধনে বাঁধিয়া দেওয়া। এক বিশাল কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিবার প্রতিভা তাঁহার ছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার নির্দিষ্টনীতি, প্রজাপুঞ্জ রাজার নিকট হইতে সুবিচার

সম্বন্ধে ছিল আশ্বস্ত। এশিয়ার বিজয়ীগণের ইতিহাসে আকবরের চিন্তাধারা অনেক পরিমাণে নূতন। বিদেশী হইয়াও, তিনি বিজিত ভারতবর্ষের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার শাসননীতির অনেকটাই পরবর্তীকালেও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। আকবর ও তাঁহার সচিববর্গ যে সকল নীতি ও প্রযোগরীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই ইংরেজ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার কীর্তি অপেক্ষাও আকবর মহৎ। বর্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে তাই আমরা তাঁহার কীর্তি আলোচনা অপেক্ষা তাঁহার জীবনের আলেখ্য রচনা করিব। তাঁহার রাজ্যজয় ও শাসন-কার্যের বিস্তৃত বিবরণ ভিনসেন্ট স্মিথের "আকবর দি গ্রেট মুঘল" গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থটিতে সত্যই কিছু ত্রুটি আছে, বিশেষত আকবর সম্বন্ধে কখনও কখনও তিনি অকরুণ, কিন্তু তবুও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আকবর সম্বন্ধে প্রধানতম আকর গ্রন্থ হইল তাঁহারই বন্ধু ও অমাত্য আবুল-ফজলের রচিত ফারসী ভাষায় লিখিত "আকবর নামাহ্" অর্থাৎ 'আকবরের কাহিনী'। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য ইতিহাস আছে। তবে আমাদের নিকট অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক রচনা হইল আকবর সম্বন্ধে জেসুইট সম্প্রদায়ের বিবরণ। তাঁহারা আকবরের রাজসভায় ছিলেন, তাঁহার সহিত কখনও কখনও যুদ্ধ-যাত্রায় গিয়াছিলেন।

ইতিহাসে এত বিশাল স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও আমাদের সামনে এত সহজভাবে বিরাজিত ও কল্পনায় এত প্রত্যক্ষ—এমন ব্যক্তি বড় বেশী নাই। তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন তাঁহার কীর্তির তুলনায়

তুচ্ছ নহে। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিগুলি যে শুধুই তাঁহার অসংখ্য চিত্রের সহিত মিলাইয়া লওয়া যায় তাহা নহে; অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রধারার মধ্যেও তাঁহার বহুমুখী কর্মজীবনের ছবিটি বড় প্রত্যক্ষ। এই চিত্রগুলির অনেকগুলিই এখন এই দেশে রহিয়াছে। এই চিত্রগুলিতে দেখিতে পাই তিনি যুবক। সুগঠিত, পেশীবহুল, একটু আঁটোসাঁটো; তাঁহার উচ্চতা নাতিদীর্ঘ, কিন্তু ব্যূঢ়স্কন্ধ, খুব কৃশ বা দৃঢ় কোনটাই নন, পাকা গমের রংএর মত তাঁহার সুন্দর গায়ের বর্ণ। তাঁহার চক্ষুদ্বয় একটু ক্ষুদ্র কিন্তু পক্ষ্মরাশি দীর্ঘ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গের উপর সূর্যালোক পড়িলে যেমন আলোকরেখা ঝলসিত হয় তাহারা তেমনই উজ্জ্বল। তাঁহার গুম্ফ আছে কিন্তু শ্মশ্রু নাই। কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং গম্ভীর। হাসিলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভরিয়া যায়। যৌবনে অতিরিক্ত অশ্বারোহণের ফলে তাঁহার পা দুইটি বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। মাথাটি দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়া থাকে। নাসিকাটি নায়কোচিত বঙ্কিম নহে, ছোট এবং সরল, নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রশস্ত, কখনও কুঞ্চিত কখনও প্রসারিত হইতে থাকে। বামদিকের নাসারন্ধ্রের নীচে একটি জড়ুল, চেহারার সহিত মানাইয়াছে ভাল। যে কোন প্রকার জনমণ্ডলীর মধ্যেই বোঝা যায় তিনিই রাজা। শক্তির বিচ্ছুরণ তাঁহার চারিদিকে। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতই উগ্র, এই উগ্রতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এত বেশী সচেতন ছিলেন যে তিনি যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতেন দ্বিতীয়বার সমর্থিত না হইলে পালন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রচণ্ড, তবে তাহা সহজেই শান্ত হইত। তাঁহার কৌতূহলের তৃপ্তি হইত না। নূতন বস্তুর প্রতি ছিল ভালবাসা। দেহ ও মন ছিল নিত্যই কর্মরত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একমাত্র স্পেনের ফিলিপকে ছাড়িয়া দিলে যিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি, কাব্য ও ইতিহাসে যিনি সুশিক্ষিত, দার্শনিক আলোচনায় যাঁহার আনন্দ, সেই আকবর ছিলেন নিরক্ষর। তিনি না পারিতেন পড়িতে, না জানিতেন লিখিতে। সত্য, যে আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুরের একটি জীবনী-গ্রন্থের মূল্যবান পাণ্ডুলিপির উপর অতি সযত্নে শিশুর মত অপটু হাতে আকবর একটি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর ইহাকে আকবরের স্বহস্তলিখিত বলিয়া সাক্ষ্যও দিয়াছেন। কিন্তু স্বাক্ষরটিকে যে এক বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া রাখা হইয়াছে তাহাই আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে লোকের ধারণাকে সমর্থন করে। আকবর পড়িতে পারিতেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তাঁহাকে বই পড়িয়া শোনান হইত, এবং বইগুলির বিষয় সম্বন্ধে নিজে পড়িলে যত জানিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশীই জানিতেন। বাস্তবিকই তাঁহার স্মৃতিশক্তি তাঁহার অন্যান্য শক্তির মতই অসামান্য ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ হইতে কোন ভ্রমণকারী যখন অবশেষে মুঘল রাজত্বে উপস্থিত হইতেন তখন সম্রাটকে নিকট হইতে দেখিবার এবং তাঁহার বাক্যালাপ শুনিবার সুযোগ লাভ করিতে কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না। বিদেশীয়গণ তাঁহার সভায় সর্বদা স্বাগত হইতেন। ফতেপুর সিক্রিতে আকবর অকস্মাৎ যে অপূর্ব অদ্ভুত নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন (এবং তেমনই অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন) সেই নগরীর রাজমহলে এশিয়ার কত জাতি আসিত—পারসিক, তুর্কী, হিন্দু আরও কত বিভিন্ন মতাবলম্বী। "মহামুঘল"-এর কথা পাশ্চাত্যদেশে রূপকথার মত মনে হইত।

অথচ এখানে ইউরোপের মতই সভ্যতার সব লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, যদিও বাহিরে তাহাদের পৃথক মনে হইত। বাহিরের আড়ম্বরের মধ্যে হয়ত বর্বরতার স্পর্শ ছিল। কিন্তু সেইসময়েই ইউরোপীয় রাজসভায় সূক্ষ্মতার সহিত কী পরিমাণ বর্বরতা মিশ্রিত ছিল! সুগন্ধের অন্তরালে ছিল কী মালিন্য! এখানে ছিল সর্বপ্রকার সূক্ষ্মতা: শুধু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও তাহার উপচার রচনাই নয়, শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ। রাজসভায় কবিতা ছিল বিশেষ সম্মানিত: পারসিক কবিদের শব্দচাতুর্য মারিনি ও তাঁহার উত্তর-দেশীয় অনুকারকবৃন্দের কবিতার সহিত একাসনে বসিবার দাবী করিতে পারে। রাজসভায় সম্রাটের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অসংখ্য চিত্রকর ও স্থপতিদের আগমন হইত। সম্রাট স্বয়ং চিত্রাঙ্কন শিখিয়াছিলেন, সংগীতেও নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাছাড়া অন্তত ছয়প্রকার হস্তকর্ম জানিতেন। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিতর্কে এবং ধর্মীয় সংগ্রামের মধ্যেও উচ্চসভ্যতার স্পর্শ ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ধর্মীয় বিতর্কের হিংস্রতার সহিত তাহাদের তুলনা করা যায়। কিন্তু ইউরোপে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ধর্মের উৎসাহে একে অপরকে আগুনে পুড়াইয়াছে, সমূলে বিনষ্ট করিয়াছে, ধর্মের নামে সমগ্র দেশ ধ্বংস করিয়াছে। এখানে, ভারতবর্ষে, শক্তির সংযমের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতর্ক শেষ পর্যন্ত অসিযুদ্ধে পরিণত হয় নাই। সত্যই এখানে একজন সম্রাটকে দেখিতে পাই, তিনি সহনশীলতায় বিশ্বাসী।

যাহাই হউক, আমাদের ভ্রমণকারী যে কোনদিন আকবরকে সভায় দেখিতে পাইবেন। তিনি দিনে দুইবার দর্শনপ্রার্থীদের সম্মুখে আসেন। রক্তপ্রস্তর নির্মিত প্রাসাদের মধ্যে একে একে সভাসদ বা রাজদূতদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ

সত্ত্বেও বারান্দার স্তম্ভগুলির ধারে গভীর ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, অলিন্দের উপরে ময়ূরগুলি রৌদ্র পোহাইতেছে, প্রাঙ্গণে হস্তীগুলিকে ধীরে ধীরে লইয়া যাওয়া হইতেছে; একজন পরিচারক একটি চিতাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আর সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্রে ও নানাবর্ণসুশোভিত প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ এক জনতা নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে। আকবর একটি আজানুলম্বিত দীর্ঘ আংরাখা পরিয়াছেন (তিনি গোঁড়া মুসলমান হইলে ইহা আগুল্‌ফ লম্বিত হইত), সুবিন্যস্ত একটি উষ্ণীষ তাঁহার মাথায়, তাহাতে কেশরাশি আচ্ছন্ন হইয়া আছে; কণ্ঠে তাঁহার অতি মূল্যবান মুক্তার মালা। তাঁহার আচরণের পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম। সম্ভ্রান্তের সহিত তিনি সম্ভ্রান্ত ও নমনীয়, দীনের সহিত তিনি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, উপহার পাইতে তাঁহার বড় ভাল লাগে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মহার্ঘ উপহারগুলি অপেক্ষা তিনি দরিদ্রদের নিকট হইতে ছোট ছোট উপহার গ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্তদের উপহারগুলির দিকে তিনি চাহিয়াও চাহেন না। বিচারকর্তা হিসাবে তিনি খ্যাত, একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে সকল নিরপরাধ ব্যক্তির ধারণা যে "সম্রাট তাহারই পক্ষে।"

আকবর দিনে চারবার প্রার্থনা করেন: সূর্যোদয়কালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং নিশীথ রাত্রে। দিনে তিনি যে পরিমাণ কাজ করেন তাহা লৌহনির্মিত শরীর না হইলে অন্য কাহারও পক্ষে করা কঠিন। তাঁহার তিনঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। দিনে আহার করেন মাত্র একবার। তাহারও কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। মাংস খান অল্পই, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুর পরিমাণও কমিয়া আসে। তাঁহার একটি উক্তি স্মরণযোগ্য, "কেন আমরা মৃত পশুদের শবাধার হইব।" ভাত,

মিষ্টান্ন এবং ফল তাঁহার প্রধান খাদ্য। ফল তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি উঠিতেন অতি প্রত্যূষে, কিন্তু দীর্ঘ দিন কাজে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। সচিববৃন্দ বা সেনাপতিগণের সহিত রাজ্যসংক্রান্ত পরামর্শ এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি হস্তী (হস্তীশালায় পাঁচহাজার হস্তী ছিল), অশ্ব এবং অন্য পশু পরিদর্শন করিতেন। তিনি তাহাদের নাম জানিতেন, শারীরিক অবস্থা বুঝিতেন। কাহাকেও কৃশ বা দুর্বল দেখিলে পশুশালার অধ্যক্ষকে তাহার অনবধানতার জন্য বেতন কম পাইতে হইত। ছাদের উপরে নীল ও সাদা রংএর ইট দিয়া পায়রার খোপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অসীম আনন্দে দেখিতেন কেমন করিয়া বাঁশীর শব্দসঙ্কেতে পায়রাগুলি ডিগবাজী খায়, দল হইতে বাহিরে চলিয়া যায়, আবার দলে ফিরিয়া আসে ; কখনও বা সারিবদ্ধভাবে উড়িতে থাকে। কখনও বা একা একা বিচরণ করে। দিবসের কিছুকাল কাটে অন্তঃপুরে, হারেমে। হারেমে তিনশত মহিলা ছিলেন। কোন সময়ে (মার্কাস অরিলিয়াস-এর মত) যোদ্ধাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হস্তীযুদ্ধ বা হস্তী ও সিংহের মধ্যে যুদ্ধ দেখিতেন। যদিও এইরূপ আমোদ-উল্লাসের মধ্যে উৎসাহে যোগ দিতেন, তথাপি নানা চিন্তায় তাঁহার মন পূর্ণ হইয়া থাকিত। সাম্রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত হইতে দূত আসিত, তাঁহাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইত। কোন সময় তিনি চিত্রশালা পরিদর্শনে যান, চিত্রীদের কাজের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুত চলিয়া যান। কিংবা চলিয়া যান কারখানায়, সেখানে গিয়া ছুতার বা পাথরের কারিগর বনিয়া যান। বিশেষভাবে ভাল লাগে লোহা গলাইবার কারখানা, নিজের হাতে গড়া কামান দেখিতে তিনি ভালবাসেন।

যখন প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ কক্ষে সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া উঠে, সম্রাট সপারিষদে আসন গ্রহণ করেন। তাঁহাকে বই পড়িয়া শোনান হয়। কিংবা কোন সুর বাজান হয়। আকবর নিজেও তাহাতে যোগ দেন কিংবা রসিকতা ও গল্পে তিনি হাসেন। যদি কোন বিদেশী সেখানে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকে অবিশ্রাম নানা প্রশ্ন করেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া তিনি ধর্মবিষয়ক আলোচনা শোনেন। ইহাতে তাঁহার গভীর আনন্দ। তিনি সুরা পান করেন, কখনও সুরায় আফিম মিশাইয়া লন। কখনও কখনও আচ্ছন্ন হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড শক্তির কোন ক্ষতি হয় না। এই কর্মব্যস্ত, সদাচঞ্চল জীবন কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। প্রায়ই তিনি পালাইয়া গিয়া নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাকী চিন্তা করিতেন।

এই হইল আকবরের রাজসভার জীবন। আর রাজসভার জীবন ত' যুদ্ধযাত্রার অন্তবর্তীকালে কাটে। বিভিন্ন যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি এক বিরাট মৃগয়ার আয়োজন করেন। যুদ্ধযাত্রার সময়ও যখন কোনরূপ দ্রুত চাঞ্চল্যের প্রয়োজন থাকে না, তখনও সাধারণত এইভাবে জীবনযাপন করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল বিখ্যাত মানুষের কথা আমরা জানি তাহাদের মধ্যে কয়জনের জীবন সম্বন্ধে এত বেশী জানি ?

তবুও কি সত্যই আমরা মানুষ আকবরকে জানি ? কী তাঁহার চরিত্রের সত্যরূপ ? তাঁহার সম্পর্কে একেবারে পরস্পরবিরোধী মত আছে, তাঁহার বহু আচরণের ব্যাখ্যাও ঠিক পরস্পরবিরোধী ভাবে করা সম্ভব।

আকবরের নিজস্ব ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সাক্ষ্য বেশ পক্ষপাতদুষ্ট মনে হইতে পারে। তিনি সত্যই বেশী তোষামোদ করিয়াছেন। নিপুণভাবে অনেক ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি, অন্তত আমাদের কাছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ নহে—তাই আমরা জেস্যুইটদের বক্তব্য শুনিতে পারি, কারণ আকবরকে তাঁহার প্রাপ্যের অধিক সম্মান দিবার কোন কারণ তাঁহাদের নাই।

বারতোলি লিখিতেছেন, "তিনি কখনও কোন লোককে তাঁহার মনের একান্ত ভাবনা জানিবার সুযোগ দিতেন না, কিংবা কি যে তাঁহার বিশ্বাস বা ধর্মমত বুঝিতে দিতেন না। কিন্তু যেভাবেই হউক তিনি তাঁহার স্বার্থে লাগিতে পারে মনে করিলে দুই দলের সহিতই মিষ্টকথার দ্বারা একদল অথবা অন্যদলকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করিতেন। দৃশ্যত, তিনি সকলপ্রকার দোষমুক্ত, একজনকে যতটা সৎ ও স্পষ্ট কল্পনা করা যায় তিনি ততটাই সৎ এবং স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত চাপা ও আত্মকেন্দ্রিক, কথা ও কাজের প্রকৃতি বঙ্কিম এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট, বেশীরভাগ সময়েই তাহারা এত পরস্পরবিরোধী যে বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চিন্তার সূত্র সন্ধান করা যায় না।"

এই হইল একটি মত: একটি মূর্তিমান ধূর্তের চিত্র, যাহার কোন মনোভাব বোঝা যায় না। বাহ্যত সরল, অন্তরে সূক্ষ্ম, চতুর এবং স্বার্থসন্ধানী। এই মত মানিয়া লইলে আকবরের আচরণ ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ হইয়া যায়। যখন তিনি কোন বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার এই করুণাপূর্ণ আচরণ সমকালীন ব্যক্তিগণ অসাধারণ বলিয়া গণ্য করিলেও, তাহাকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন মনে করিতে

হইবে। তাঁহার পররাজ্যের সহিত যুদ্ধকে কেহ কেহ মহৎ উদ্দেশ্য প্রসূত বলিয়া বর্ণনা করিলেও, মনে করিতে হইবে তাঁহার আচরণ পুকুরস্থিত দুর্বল প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচারী বোয়াল মাছের মত। প্রকৃতপক্ষে, আকবরের চরিত্রের সত্যরূপ এত সহজ নহে। তাঁহার চরিত্র স্বভাবেই জটিল। জটিল পারিপার্শ্বিকে সেই জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। কিন্তু আরো একটু নিকট হইতে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক।

জেসুইটগণ ধর্মালোচনার মধ্য দিয়া আকবরের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিজের ইচ্ছাতে আহ্বান করিয়াছিলেন আর তাঁহাদের আশা ছিল যে আকবর ধর্মান্তরিত হইবেন। কিন্তু আকবর সর্বদাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন। সেইজন্যই আকবরের প্রতি তাঁহাদের বিরক্ত হইবার কিছু কারণ আছে এবং বারতোলির ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাস নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ধর্মীয় প্রসঙ্গ অনুপস্থিত, যখন বিষয়টি নিরপেক্ষ, পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ নাই তখন তাঁহাদের বক্তব্যে এক স্বতন্ত্র সুর লক্ষ্য করি। "সম্রাট স্বভাবে সরল এবং সহজ"—এই কথাটি বলিয়াছিলেন জেসুইট মনসারেট। ইনি কাবুল অভিযানের সময় আকবরের সঙ্গে ছিলেন। আকবর যখন অবিষ্কার করিলেন যে যে ব্যক্তিকে তিনি নানা সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন সেই একজন বিশ্বাসঘাতক, সেই সময়কার ঘটনাবলী স্মরণ করিয়াই এই কথাটি বলা হইয়াছিল। পেরশী নামে এক ব্যক্তি আকবর সম্বন্ধে বলিয়াছেন "প্রকৃতিতে হৃদয়বান্, ভদ্র, এবং দয়াশীল।" আর একজনের ভাষায় "তিনি সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিবান্।"

"স্বভাবে সরল এবং সহজ"—আমি মনে করি ইহাই তাঁহার চরিত্রেব সত্যরূপ ; কিন্তু আমাদের জোর দিতে হইবে "স্বভাবে" কথাটির উপর। কাবণ যে ব্যক্তি আকবরের মত জীবন যাপন করিবেন, আকবর যাহা অর্জন করিয়াছেন তাহা অর্জন কবিবেন, তবুও সর্বদাই সবল এবং সহজ থাকিবেন ইহা প্রায় অলৌকিক ব্যাপার। আবাল্য তিনি অবিরত বিপদের সম্মুখীন, বিশ্বাস-ঘাতকতায়, বিদ্বেষ এবং ষড়যন্ত্রে তাঁহার পাবিপার্শ্বিক ঘেরা। কাহাকে যে তিনি বিশ্বাস কবিবেন তাহা জানা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তাঁহাকে সর্বদাই একটি মুখোস পবিতে হইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য নিজের ভাবনা লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয় এই যে তিনি চিবকাল অবিশ্বাস ও শঠতাব বর্ম পরিয়া আত্মবক্ষার চেষ্টা কবেন নাই, বরং লোকে অবিশ্বাসী প্রমাণিত হইবার পরও তিনি তাহাদেব বিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন তবুও সন্ধান কবিতে হইবে "পাপ প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু সৎ থাকে"। কিন্তু তিনি কি নিজেকে বিশ্বাস করিতেন ? যখন উচ্চাশা তাহাকে পাইয়া বসিত কিংবা একটি বিরাট পরিকল্পনা বিপদগ্রস্ত হইত তখন সম্ভবত করিতেন না। বিচার করিলে দেখা যাইবে এমন অনেকগুলি ঘটনা আছে সেগুলির পবিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে শুধু নীতিহীন, এমন কি বিশ্বাসভঙ্গকারী বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। কিন্তু তবুও মূলত, আমি বলিবই যে তিনি সৎ, এবং আন্তরিক। দেখ, যখন তিনি রিডোল্‌ফো আকুয়াভিভার মত নির্মল সৎ প্রকৃতির মানুষের সহিত মিশিতেন, তখন মনে হয় যেন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সহজাত।

"প্রকৃতিতে হৃদয়বান্ এবং দয়াশীল"। প্রত্যেকেই আকবরের

চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি একজন একনায়কের সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি অবিশ্বাসী ভৃত্যবর্গের হাতে এত পীড়িত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে ইহা বাস্তবিকই বিশেষ লক্ষণীয়। তবুও ক্রোধে তিনি ভয়াবহ নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন। ঐতিহাসিকেরা মহৎব্যক্তিদের দোষগুলিকে সমকালের দোষ বলিয়া গণ্য করিয়া তাঁহাদের অব্যাহতি দিতে অভ্যস্থ। কিন্তু সমকালের ত্রুটি হইতে যিনি যত মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহার মহত্ত্বের তাহাই তত পরিমাপক। আকবরের নিষ্ঠুরতার সহিত তুলনায় তাঁহার সমকালীন ইউরোপীয় শাসকবর্গের নিষ্ঠুর আচরণ আরও হৃদয়হীন, এমনকি বিংশ শতাব্দীর ইউরোপও এবিষয়ে নিজেদের উন্নততর মনে করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর কার্যে আমরা এত বিচলিত হই কারণ তিনি কত উদার ও ক্ষমাশীল হইতে পারিতেন। আকবর বলিয়াছিলেন "রাজপুত্রের মহত্তম গুণ হইল অপরাধ ক্ষমা করা"। চেঙ্গিসখান ও তৈমুরলঙের মত হৃদয়হীন দিগ্বিজয়ী আর জগতে জন্মায় নাই—তাহাদের রক্তধারা আকবরের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই আকবরের চরিত্রে দয়া এবং মানবধর্মের সমাবেশ আরো বিস্ময়কর। ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে প্রথম জীবনে আকবরের দয়াধর্ম নিতান্তই কৌশল মাত্র। তিনি যদি যথেষ্ট শক্তিমান হইতেন তাহা হইলে শত্রুকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। কিন্তু কে বলিতে পারে? এক অভিপ্রায়ের সঙ্গে অন্য অভিপ্রায় মিশিয়া যায়। কিন্তু যদি তিনি অনুভব করিয়া থাকেন যে হৃদয়ধর্মের পথ শুধু উদার নহে, সঙ্গতও বটে, তাহা হইলে আমি মনে করি, তাঁহাকে ধূর্ত বলিয়া নিন্দা না করিয়া তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা উচিত।

যাহাই হউক, আকবরের দয়াধর্ম সীজারের, মতই প্রসিদ্ধ। তিনিও কি সীজারের মত মৃগী রোগী ছিলেন। তাঁহার দেশীয় ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। জেস্যুইট মনসাবেট তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানিতেন, কিন্তু তিনিও কিছু বলেন নাই। দ্যু জারিক জেস্যুইট-দের লেখা হইতে যে সংকলন করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে এরূপ মন্তব্য আছে বটে যে পড়িয়া যাইবার ব্যাধি তাঁহার ছিল। কিন্তু এই উক্তিটি শুধু এখানেই আছে, তাহার উৎস অজ্ঞাত। জেস্যুইটরা মনে করিয়াছেন যে তিনি বিষাদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই ক্রীড়া-কৌতুকে যোগ দিতেন। কিন্তু এই অনুমানের কোন ভিত্তি আছে মনে হয় না। কিন্তু ব্যাধি সম্পর্কিত তথ্যটি অসম্ভাব্য মনে হয় না। আকবরের দ্বিতীয় সন্তান মুরাদের মৃগী হইয়াছিল।

"সকল লোকের প্রতি সমদৃষ্টিবান্"। আকবরের ন্যায়-পরায়ণতার ফলেই বিজিত দেশের অধিবাসিগণ প্রধানত নতি স্বীকার করিয়াছিল। ইহা তাঁহার স্বভাবের একটি মূল উপাদান। ইহা কোন আইনের বোধ হইতে জন্ম লয় নাই, বরং জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অমল নিষ্পাপ মন কাজ করিয়াছে, আমার মনে হয় যে, ইহার জন্ম সেখানেই। 'নিষ্পাপ' শব্দটির ব্যবহার অদ্ভুত মনে হইতে পারে। আমি বলিতে চাই ইহা অন্তরের একটি ক্ষমতা, এই শক্তির ফলে বস্তুকে সমস্ত রকম সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা যায়; এই সংস্কারগুলি আমরা আমাদের পারি-পার্শ্বিক হইতে গ্রহণ করি, অথবা অতীত হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি বা প্রাথমিক শিক্ষা হইতে পাই। অন্তরে এই শক্তি যাঁহার আছে তাঁহার কাছে বেশীর ভাগ মানুষ অজ্ঞাতসারে

আত্মসমর্পন করে। মুসলমান বিজয়ীগণ হিন্দুদের উপর শতাব্দী ধরিয়া কতকগুলি জিনিষ জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিল। সেগুলি প্রচলিত রীতি হিসাবে সকলে মানিয়া লইয়াছিল। তাহা ছিল বিজয়ীর প্রাপ্য। আকবরের সহজ দৃষ্টিতে সেগুলি অন্যায় মনে হইয়াছিল, প্রায় বালকাবস্থাতেই সমস্ত প্রথারীতির বিরুদ্ধে, সকল বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি সেগুলি রদ করিয়াছিলেন। আবার অতি বিপজ্জনক বাধার বিরুদ্ধে গিয়া তিনি জেসুইট-দের সহিত ধর্মালোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং প্রায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। তবে শেষে তাঁহার বাধা হইল কোথায়? তাঁহার মনে একটি চিন্তাই ছিল এবং শিশুর মত জিদ ধরিয়া তিনি এই চিন্তাক্ষেত্রেই বার বার প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন: জগতে অনেক সৎ ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মমত পোষণ করেন, প্রত্যেকেই বলিতেছেন তাঁহার ধর্মই সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা; কিন্তু তিনিই যে ঠিক তাহা তিনি কিরূপে নিশ্চিত হইলেন? আকবর হইলেন ধর্মান্ধের ঠিক বিপরীত। অন্যদিকে, তাঁহাকে কিছুতেই উদাসীন প্রকৃতির বলা চলে না। এই কর্মীপুরুষ, জীবন-প্রেমিক, শক্তিদীপ্ত দেহী সংসারপথে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে চলিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে বিষাদ, আত্মবিচারণার চিন্তা, অতৃপ্তি এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে গভীরে লুকাইত। বাল্যকাল হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁহার মানুষ চিনিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে, বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়াছে, ব্যগ্র ধর্মবিদ্‌গণ তাঁহার বিদায়ী আত্মার পরিত্রানের জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন, তখন শোনা গেল

তিনি অস্ফুট গুঞ্জরনে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জেসুইটগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণভাবে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা না পাবিলে আর কোন কিছুই চান নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছেন আকবর সম্ভবত তাঁহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের জন্য তাহাদের সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার যুক্তির সারল্য—এই সারল্য মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, ইহা কখনই তাঁহাকে বাহিরেব কোন শাসনের হাতে আ্ত্মসমর্পন করিতে দেয় নাই। ইহা শেষ পর্যন্ত বাহিরের শাসনকেই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়াছে। আকবরের সমস্ত দুর্বলতা ও ত্রুটির মধ্যেও একটা কিছু ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁহার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি নিতান্ত তুচ্ছ নহে; বরং তাঁহাকে যে সব গুণ মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের সহিতই যুক্ত। তিনি ছিলেন সর্বোপরি একজন মানুষ।

২

আকবরের উত্তরাধিকার কি ? তাঁহার মনের পটভূমিকাটি কি ?

আমাদের শোণিতে যে ইউরোপীয় ঐতিহ্যস্রোত বহিতেছে তা মুহূর্তের জন্য ভুলিতে হইবে। ইহার সহিত আমরা এমন অভ্যস্ত যে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমরা সব কিছুই মানিয়া লই : গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বোমের সাম্রাজ্য-স্মৃতি, রোমের আইন, রোমের পথঘাট, মধ্যযুগের ঐতিহ্যের সকল জটিল চিন্তাসূত্র। সেইস্থলে মনে কর মুসলমানী সংস্কৃতির কথা। মুসলমান সংস্কৃতি আমাদের সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ ইসলাম ইহুদীধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম এবং আরবী লেখকগণের মধ্য দিয়া গ্রীসের চিন্তাধারার নিকট হইতে বহুল জিনিষ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইরানী বাস্তুবিদ্যা, ইরানী কাব্য, ইরানী চিত্র—ইরানের ক্লাসিকগুলির সহিত যুক্ত। ইহার পশ্চাতে আছে চীনের শিল্পকলা। যদিও ইহা স্বল্পজ্ঞাত, তবুও ইউরোপে গ্রীসের যে সম্মান, (এশিয়ায়) ইহা সেইরূপ শ্রদ্ধেয়। আকবর এই ঐতিহ্য লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আকবরের দেহে ছিল তুর্কী, মুঘল এবং পারসিক রক্ত। পিতার দিক হইতে তিনি তৈমুরের সপ্তম বংশধর, মাতার দিক হইতে বাবরের সঙ্গে যুক্ত, বাবর চেঙ্গিস-খানের বংশধর। এই দুই প্রবল বিশ্ববিজয়ী এশিয়ার ইতিহাসে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বে এবং পরে যত বিশ্ববিজয়ী আসিয়াছেন সকলের তুলনায় তাঁহাদের দেশজয় অনেক বিস্তৃত, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা প্রায় অর্থহীন মনে হয় : তাঁহাদের ক্রোধের কাহিনী, নগরীর ধ্বংসাবশেষ, ধূম ও অগ্নি ;

আর্তনাদ ও হত্যাকাণ্ড ; যেন কোন ভয়াবহ স্বপ্নের ছায়াছবি, তাহার পর শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। দূর হইতে দেখিলে নেপোলিয়ানের বিদ্যুৎগতিতে দেশজয়, রবার্ট ব্রিজেস-এর যথার্থ এবং বিদ্রূপাত্মক ভাষায় 'Sheep-worry of Europe', তাহাও কি এইরূপ মনে হয় না? কিন্তু চেঙ্গিস এবং তৈমুর যতই ধ্বংসের উন্মাদনায় উন্মাদ হউক না কেন, তাঁহারা বর্বর ছিলেন না (তৈমুর যখন নগর ধ্বংস করিতেন সর্বদাই সেখানকার শিল্পীদের ছাড়িয়া দিতেন) তাঁহারা ছিলেন অতি প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ; তাঁহাদের সৈন্যগণ লৌহ-কঠিন-শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত হইত ; তাঁহাদের যুদ্ধ পদ্ধতি ও আক্রমণ কৌশল আকবরেরও আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি সেই সামরিক ঐতিহ্য কখনই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং তাহার নৃশংসরীতি কিছুটা বজায় রাখিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার রণজয় ছিল ভিন্নপ্রকৃতির। হিন্দুস্থান জয় করিয়া তিনি ভারতীয় হইতে চাহিলেন। যে ভারতবর্ষ কোন গোপন এবং অজানা বন্ধনে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল তিনি সম্পূর্ণভাবে তাহারই অধিবাসী হইতে চাহিলেন।

আমার মনে হয় না যে অতীত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠশাসক অশোকের নাম আকবর কখনও শুনিয়াছিলেন। আজ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পরিশ্রমের ফলে অশোক সম্বন্ধে যেমন জানা যাইতেছে, তেমনই আকবর যদি তাঁহার উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের কথা জানিতেন, কল্পনা করিতে পারি তিনি কী বিপুল আগ্রহে অশোকের জীবনী ও তাঁহার শাসন পদ্ধতি আলোচনা করিতেন। কারণ অশোকের সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। নেপাল, কাশ্মীর সহ সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার সাম্রাজ্য।

অশোক মৌর্যরাজা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বেবিলনের শাসনকর্তা সেলুকস যখন হিন্দুস্থানে আলেকজাণ্ডারের ক্ষণস্থায়ী আধিপত্যকে পুনস্থাপন এবং বিস্তারিত করিতে চাহিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া উত্তরভারতে দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অশোক একটি দৃঢ় গঠিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারলাভ করিয়াছিলেন, নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। অবশ্য পার্শ্ববর্তী দুই একটি অঞ্চলকে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে হইয়াছে। তাঁহার সিংহাসন লাভের ত্রয়োদশ বর্ষে, সম্ভবত খ্রীষ্ট পূর্ব ২৬১ তে অশোক বঙ্গোপসাগরের কূলে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই রাজ্যজয়ই তাঁহার সমগ্র জীবনের ধারা পাল্টাইয়াছিল।

সীজার 'আসিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন এবং জয় করিয়াছিলেন'। অশোক আগে জয় করিয়াছিলেন, পরে দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যুদ্ধ ও অভিযানের অর্থ কি? তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহাব জন্য লক্ষ মানুষ হত হইয়াছে, পঞ্চাশ সহস্রের অধিক বন্দী হইয়াছে এবং অগণিত মানুষ মারা গিয়াছে বা নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। তিনি দুঃখে ও বিষাদে ভরিয়া উঠিলেন। তখন হইতেই শুরু হইল নূতন জীবন। স্থির করিলেন তিনি বিজয়ীই হইবেন তবে এবার আর অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ নয়, ধর্মের জয়। এ বিজয় 'পরিপূর্ণ আনন্দের'। সম্রাট চাহিলেন সকল প্রজার জন্য 'নিরাপত্তা, আত্মসংযম, মনের শান্তি ও আনন্দময়তা'।

অশোক বুদ্ধের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ অভিযানের অব্যবহিত পরেই তিনি সাধারণ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুতে পরিণত হন।

অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণ মানব ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৌদ্ধধর্ম তখনও পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ইহার পরেই তাহা বিশ্বধর্মে পরিণত হইল। অশোক তাঁহার চল্লিশবৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে কখনই তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাপ্রচারে শৈথিল্য দেখান নাই। তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র, দূর দূরান্তরে, যেখানেই উপযুক্ত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর এবং পর্বতের গায়ে সকল প্রজার জন্য নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে বাণী লিখিতভাবে প্রচার করা হইয়াছে। শুধু নিজের প্রজাদের নিকট বুদ্ধবাণী প্রচার করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, ম্যাসিডোনিয়া এবং এপিরাস প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অশোক যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবুও নির্জনে ধ্যান করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মশীল এবং অন্যকেও কাজ করিতে বলিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ছোট বড় সকলেই কাজে আত্মনিয়োগ করুক।' 'সর্বজনের হিত' ছিল তাঁহার অবিরাম চিন্তার বিষয়। তিনি শুধু সন্তানবাৎসল্য, সত্যবাদিতা, দয়া, ভিক্ষুকসেবা, জীবনের পবিত্রতা এবং অন্যের সৎ বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা—ইত্যাদি কর্তব্যের কথাই প্রচার করেন নাই, শাসনের ব্যবহারিক খুঁটিনাটির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল—মানুষ ও পশুর আরামের জন্য তপ্তধূলিধূসর পথের পার্শ্বে ছায়াশীতল ফলবান বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে, কূপ খনন করিতে হইবে, পান্থশালা নির্মাণ করিতে হইবে, জলাশয় প্রস্তুত করিতে হইবে, ব্যাধি নিবারক লতাগুল্ম জন্মাইতে হইবে, আতুরের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠশাসকগণের মধ্যে স্বতন্ত্র, এই একজন সম্রাট—তিনি আকবরের সহানুভূতি এবং বিস্ময়ের বস্তু হইতে পারিতেন। তবে নিঃসন্দেহে আকবর তাঁহার যুদ্ধত্যাগের নীতি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তিনি যে বিষয়ে তাঁহার প্রতি সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হইতেন তাহা তাঁহার সহনশীলতার নীতি। এই নীতি রোম্যানদের মত উদাসীনতাজাত রাজনৈতিক সহনশীলতা নয়, ইহা আকবরের নিজের মনোভঙ্গির মতই—সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত। ইহা সত্য যে মুঘল সম্রাটের সম্মুখে যে কণ্টকাকীর্ণ সমস্যা ছিল অশোকের সম্মুখে তাহা ছিল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বহু ঐক্য আছে, ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মের মত উগ্র মতবাদও ছিল না। তাহা ছাড়া সাফল্যময় যুদ্ধের দ্বারা গঠিত একটি সাম্রাজ্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ কবা তাঁহাব পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

আকবর ইতিহাসের প্রদীপ্ত রৌদ্রালোকিত অধ্যায়ে দণ্ডায়মান। মনে হয় তাঁহার দুইদিকে দুইটি ছায়াধূসব, এবং আশ্চর্যভাবে বিপরীত জগৎ। একদিকে, তাঁহার মধ্যএশিয়ার পূর্বপুরুষদের জগৎ, মানবশক্তির প্রমত্ত উচ্ছ্বাসের জগৎ, শুধু শক্তির জন্যই শক্তিকে পূজা করা, মানুষ অথবা পশুশিকারের উন্মাদনাগ্রস্ততা—আকবরের বিশাল মৃগয়ার আয়োজন যেন তৈমুরলঙের হত্যা অভিযানের প্রতিধ্বনি—এক নৃশংস কর্মোদ্দীপনার জগৎ স্বপ্নের মধ্যে মিলাইয়া যায়। আর একদিকে, ভারতবর্ষের জগৎ, সেই জগৎও বিলাস ও নৃশংসতায় উন্মত্ত কিন্তু তাহা বুদ্ধ এবং অশোকের মত জ্যোতির্ময় আত্মার জন্মদাতা, সেই জগৎ এইসকল বন্য দিগ্বিজয়ীর অপেক্ষা বহু প্রাচীন অতীত হইতে কথা বলে, কিন্তু সেই বাণী এখনও আমাদের

মনে সজীবতা ও প্রাণে আলোড়ন আনে। আকবর অতৃপ্তশক্তির নেশাগ্রস্ত ছিলেন, তিনি যেন মূর্তিমান কর্ম, তবুও ,তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমনই একটি ভিন্ন বস্তু ছিল, তাহা চিন্তা এবং ধ্যানের জন্য ছিল তৃষিত, তাহা সন্ধান করিত ন্যায়পরায়ণতা, কামনা করিত নম্রতা।

৩

কিন্তু তাঁহার আরও প্রত্যক্ষ বংশ পরিচয় কি ?

একবার, আকবর একটি যুদ্ধাভিযান হইতে ফিরিয়া মনসারেট-এর নিকট পর্তুগালের রাজা সেবাস্তিয়ান সম্পর্কে প্রশ্নাদি করিতেছিলেন। এই রাজা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে ১৫৭৮এ রণক্ষেত্রে মারা যান। সমস্ত কাহিনী শুনিবার পর আকবর আবেগে ফাটিয়া পড়িলেন। 'যাঁহারা রণক্ষেত্রে ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন তাঁহাদের বীরত্বের হয়ত যথোপযুক্ত প্রশংসা করিতে পারি না, কিন্তু যাহারা যুদ্ধের চিরন্তন মহিমা অপেক্ষা আত্মরক্ষায় বেশী তৎপর তাহাদের কাপুরুষতার নিন্দা চিরকাল করিব।'

বিপদের উল্লাস, যুদ্ধের চিরন্তন মহিমা! ইহা বাবরের উক্তি হইতে পারিত। বাবরের পিতা ছিলেন খর্বকায়, দৃঢদেহী, উদাসীন এবং অস্থির। জুন মাসের একদিন তিনি যখন একটি গর্তের উপবের ছাদে পায়রার ঘরে পায়রা দেখিতেছিলেন হঠাৎ ছাদ ভাঙিয়া গর্তে পড়িয়া অন্যলোকে যাত্রা করিলেন, তখন হইতেই একাদশবর্ষ বয়স্ক বাবরকে তাঁহার সিংহাসন, তাঁহার জীবন ও তাঁহার উচ্চাভিলাষের জন্য সংগ্রাম কবিতে হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি আনন্দই পাইয়াছেন। যে মুহূর্তে তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন তখনই ক্ষিপ্রগতিতে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার রাজধানী তিনবার আক্রান্ত হইল। তিনি আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদের দমন করিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি তাঁহার পূর্ব-পুরুষ তৈমুরের নগরী, তাঁহার স্বপ্নের নগরী সমরকন্দ অবরোধ করিলেন, মাত্র একশত দিন অধিকার রাখার পর সে নগরী

হারাইলেন। পরে দুইবার এই নগরী অল্পদিনের জন্য তিনি জয় করিয়াছিলেন, তারপর হারাইলেন চিরকালের ,জন্য। তাঁহার উজ্‌বেগী শত্রুগণ বড় প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। তাঁহার ছোট রাজ্য ফারগানাও তাঁহাকে হারাইতে হইল। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি সমরকন্দে তৈমুরের সিংহাসনে বসিবেন। সেই আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসনের স্বপ্ন তাহাকে পবিত্যাগ করিতে হইল কিন্তু যখন নির্বাসনে পাহাড়ী মেষপালকদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন তখনও যে কোন একটি সিংহাসন লাভের জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অদৃষ্টের প্রতি ছিল তাঁহার প্রচণ্ড বিশ্বাস। তিনি দক্ষিণমুখী হইলেন, কাবুলের রাজা ছিলেন বাবরের এক পিতৃব্য, তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই সেখানে অরাজকতা। তিনি কাবুল অভিযানে মনস্থ করিলেন এবং কাবুল জয় করিলেন। এখান হইতেই তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার নিজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে যখন তিনি কাবুলেব প্রভু হইলেন তখন হইতেই হিন্দুস্থান জয়ের বাসনা তাঁহার মনে দেখা দিয়াছিল। বহুকাল আগে তাঁহাকে এক বৃদ্ধা রমণী তৈমুরের ভারত অভিযানের গল্প বলিয়াছিল বাবর তাহা ভোলেন নাই। তৈমুরের সিংহাসন সমরকন্দ যখন তিনি পাইতে পারেন না, তখন তিনি পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দক্ষিণমুখী হইতে ত' পারেন। কিন্তু কাবুল অভিযানের বাইশ বৎসর পরে তিনি বিজয়ীর মত দিল্লীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যই আকবর শাসন করিয়াছেন।

প্রকৃতিতে এবং চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে আকবরের

সহিত তাঁহার পিতামহের মিল আছে। তবে অমিলগুলিই আমরা লক্ষ্য করিব।

বাবর অতি খোলাখুলি ভাবে একটি মনোরম 'আত্মজীবনী' লিখিয়াছেন। জীবন গ্রন্থবাশিব মধ্য ইহা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গ্রন্থে তিনি নিজের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অতি প্রত্যক্ষবৎ। তাঁহাব রক্তে ছিল মোঙ্গল অস্থিরতা ; তবে তিনি ছিলেন অনেক বেশী পবিমাণেই তুর্কী। যে সকল মোঙ্গলদের জানিতেন তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে এমন শব্দ নাই যাহা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ছিল অমানুষিক শক্তি ও সম্পূর্ণ ভয়হীন অসমসাহসিকতা। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত লইতেন। দ্রুত কাজের দ্বারা প্রায়ই সাফল্য লাভ কবিতেন কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার বাস্তব জ্ঞানশূন্য আত্মপ্রত্যয়েব জন্য বিপদের মধ্যে পড়িতেন। অবশ্য এইরূপ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লাভ কবিতেন যথেষ্ট। তিনি তাঁহার সৈন্যদেব অতি উচ্চস্তবের কর্মদক্ষতায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন রণপণ্ডিত। তাঁহার শৃঙ্খলাবোধ ছিল অত্যন্ত কঠিন, কখনও কখনও তিনি বর্বরের মত নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন (বোধহয় মোঙ্গল স্বভাব বাহির হইয়া পড়িত), তবুও সাধারণভাবে তিনি ছিলেন বীব, অনুগত, হৃদয়বান্ এবং ক্ষমাশীল। সর্বাপেক্ষা ঘৃণা কবিতেন মিথ্যাচার।

প্রথমদর্শনে বাবরকে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অপূর্ব রোমাঞ্চপ্রিয় ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু মনে না হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার জীবনের চমকপ্রদ পতনঅভ্যুদয়ের মধ্যেও তিনি চিরকাল এক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন মনে মনে লালন করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত সফল হইয়াছেন, তাহা শুধু দৈবানুগ্রহ বা সৈনিকের অদৃষ্ট

নহে, তাহার মূলে আছে তাঁহার বিস্ময়কর একাগ্রতা আর তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্বাস। শুধু একজন রোমাঞ্চপ্রিয় ব্যক্তি হিসাবেও তিনি অসাধারণ। তিনি দৃঢ় সৈনিক, অপূর্ব যোদ্ধা; পথে যতগুলি নদী পড়িয়াছে সবই তিনি সাঁতার দিয়া পার হইয়াছেন, তিনি আমাদের তাঁহার অসাধারণ সূক্ষ্মচিত্ততার জন্য বিস্ময় উদ্রেক করেন। একজন লোক যেমন অসিযুদ্ধের কুশলতায় তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারিত, তেমনই পারিত কবিতাপ্রিয়তায়। দুঃসময়ে হয়ত তিনি মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের লইয়া শত্রুদের হাত হইতে পলায়ন করিতেছেন। অশ্ব-চালনা করিতে করিতে পথে কয়েকটি চরণ কবিতা রচনা করিলেন, আর যেন অমনি মায়াবলে তাঁহার শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইল। তাঁহার অফুরন্ত জীবনোল্লাসের উৎসের অনেকটাই ছিল জগতের রূপে তাঁহার গভীর আনন্দ। এমন পুষ্পপ্রিয় আর কোথায় দেখিয়াছি? একটি নূতন জায়গা অধিকার করিলেন, তাঁহার প্রথম চিন্তা হইল কিভাবে একটি উদ্যান রচিত হইবে, তিনি নিজেই ফুলের মাটি তৈয়ারী করা, জলের নালি প্রস্তুত করা পরিদর্শন করিবেন। ১৫৩০এ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববৎসরে আতপ-ক্লান্তধূসর ভারতবর্ষে বসিয়া তিনি লিখিতেছেন, "সেদিন তাহারা আমার জন্য একটি সুগন্ধি তরমুজ আনিয়াছিল, কাটিবার সময় মনে হইল আমি আমার জন্মভূমি হইতে কতদিন নির্বাসিত, ঘরের কথায় মন বিষাদে ভরিয়া উঠিল, চোখের জল বাধা মানিল না।"

আসলে বাবর ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে স্বস্তি পান নাই। তিনি সর্বদাই স্মরণ করিয়াছেন তাঁহার জন্মভূমির পাহাড়গুলি, মধ্যএশিয়ার গিরিমধ্যস্থিত সুন্দর ফারগানা প্রদেশ, তাহার সুশীতল সমীরণ, তাহার নৃত্যচঞ্চলা পার্বত্যতটিনী, তাহার উর্বর শস্যভূমি,

তাহার দ্রাক্ষা, তবমুজ আব ডালিম। ফারগানা দৈবানুগৃহীত দেশ। ইহার অপূর্ব অশ্বগুলিব জন্য কি সুদূব হইতে চীনসম্রাট আগ্রহী ছিলেন না? কাবুল যদিও ফাবগানাব মত সুন্দর নয়, তবু তাহাব পার্বত্য আবহাওয়া বাববেব স্বভাবেব অনুকূল ছিল। বাববেব কাছে ভাবতবর্ষকে মনে হইয়াছিল কুৎসিত ও আকর্ষণ-শক্তিহীন। সত্য যে, তিনি ভাবতবর্ষে থাকিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাব পূর্ববর্তী অভিযানকাবীদেব মত শুধু আক্রমণ ও লুণ্ঠন কবিতেই চান নাই, কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন যে তিনি ভাবতীয়দের উপব এখন বিদেশী বিজয়ীব মতই শাসন কবিবেন। তাঁহাব নীতি তৈমুবেব নীতি অপেক্ষা অগ্রসব হয নাই। তৈমুবেব নীতি ছিল: বাজ্যগুলিকে প্রদেশে ভাগ কবিয়া একজন শাসক নিযুক্ত করা এবং একটি সাম্রাজ্য এই নীতিব উপব প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সকল উপশাসকেব উচ্চাভিলাষ ও কলহের ফলে সাম্রজ্য ভাঙিয়া যাইতে বাধ্য। তৈমুবেব বিশাল সাম্রাজ্য অতি দ্রুতই বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বাববেব সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হইয়া যায় নাই, ইহা যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া ছিল তাহা প্রধানত আকববেব গঠনমূলকনীতি ও দূবদৃষ্টিব জন্য। ইহাতেই আকববেব প্রতিভাব মহত্ত্বেব প্রমাণ। আকবরেব মধ্যে তাঁহাব পিতামহেব স্বভাবেব সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল আবো পুরুষোচিত প্রজ্ঞা। বাববেব কাব্যপ্রিয়তা এবং রূপমুগ্ধতা তাঁহার মধ্যে সর্বগ্রাসী কৌতূহল ও ধর্মীয় সমস্যায় প্রবল আগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিল। বাবব যদি হন বোম্যান্টিক, আকবরকে বলিব রিয়ালিস্ট।

বাবরের মৃত্যুব কাহিনী তাঁহার রোম্যান্টিক জীবনের উপযুক্ত। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সঙ্কটজনক বোগে আক্রান্ত, জীবন অবসান

প্রায়। বাবর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পুত্রের জীবনের বদলে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিবেন, পুত্রের রোগশয্যার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিলেন। বাবর মারা গেলেন।

আরোগ্য লাভ করিয়া হুমায়ুন সম্রাট হইলেন। হিন্দুস্থান যদিও জয় করা হইয়াছে তাহা রক্ষা করার জন্য শক্ত হাতের প্রয়োজন; হুমায়ুনের সেই শক্তি ছিল না। হুমায়ুন এখন বাইশ বৎসরের যুবক, তাঁহার কৃশ স্কন্ধ, সামান্য ঝুঁকিয়া হাঁটা, লম্বা মুখ এবং সূঁচোলো দাড়ি—সব মিলাইয়া একটু দুর্বল গঠন মনে হইত। তিনি আফিং খাইতেন। যদিও তিনি দুর্বল ছিলেন না, তবুও তাঁহার চরিত্রে একটা ছেলেমানুষি ছিল। তিনি রাজ্যশাসনতন্ত্র ও আইন অপেক্ষা স্বভাবগত প্রেরণায় তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতি বেশী মনোযোগী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাজে নামিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহাব ভাই কামবানেব হাতে আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের শাসনভার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এমনকি দিল্লীব সিংহাসনের জন্যও তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বিহারের শাসনকর্তা শেরশাহ্‌ ছিলেন সুযোগ্য শাসক, তিনি দেখিলেন আক্রমণের এই ত' সুযোগ। হুমায়ুন মর্মান্তিক ভাবে পরাজিত হইয়া মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দের সঙ্গে সিন্ধু দেশের মরু অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

৪

১৫৪২ এব নভেম্ববেব শেষ। তখন সকাল হইয়াছে। হুমাযুন একটি ছোট হ্রদেব ধাবে তাঁবু ফেলিয়াছেন। একজন সহৃদয় সামন্ত তাঁহাকে দুই হাজার অশ্বাবোহী সৈন্য দান কবিয়াছিলেন—সেই সৈন্যগণ সঙ্গে আছে। হঠাৎ হুনাযুন দেখিলেন একদল অশ্বাবোহী মরুভূমিব উপব দিযা ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। গৃহহীন সম্রাট স্বভাবতই চিন্তিত হইলেন। আজ দুই বৎসর তিনি বিজয়ী শেবশাহ কর্তৃক তাঁহাব বাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম ভারতে সিন্ধুদেশেব মরুভূমিব নিজনতায মুষ্টিমেয় অনুচবদের লইয়া ঘুবিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি কোন পবিকল্পনা কবিতে পাবিতেছেন না। তিনি কাহাকে বিশ্বাস কবিবেন জানেন না। তাঁহাব আপন ভাই কামবান ও আস্‌কাবি তাঁহাব প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্দেহজনক বন্ধু, সম্ভবত শত্রু। দ্রুতগামী অশ্বাবোহীগণ খুব সম্ভব দুঃসংবাদ বহন কবিয়া আনিতেছে। কিন্তু আজ হুমাযুন আশা কবিতে পাবেন। অশ্বাবোহীগণ অমবকোটেব দিক হইতে আসিতেছে। তিনি যেখানে তাঁবু ফেলিয়াছেন সেখান হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূবে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ সমন্বিত নগবী এই অমবকোট। আর এই অমর-কোটেই তিনি তাঁহাব তরুণী বধূকে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই মা হইবেন।

দূত আনন্দ সংকেত দিয়া শিবিবে প্রবেশ কবিল। হামিদা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। হুমাযুনেব উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। ইহা তাহা হইলে একটি মঙ্গল সঙ্কেত। তাঁহার বালিকাবধূব কথা ভাবিয়া (সন্তান জন্মকালে তাঁহার বয়স

মাত্র পঞ্চদশ) হুমায়ুন উল্লসিত হইলেন। মুকুটবিহীন এক পলাতক রাজাকে বিবাহ করিতে তিনি কখনই অধিক আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে হুমায়ুনের হৃদয় হরণ করিয়াছেন, হুমায়ুনও অতি সযতনে তাঁহাকে প্রীত করিতে চাহিয়াছেন ; আজ তিনি হুমায়ুনকে উপহার দিলেন উত্তরাধিকারী ও নবীন আশা।

এইরূপ ঘটনা উপলক্ষে আড়ম্বর, উৎসব, ও অজস্র উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হওয়ার কথা। কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে আজ গর্বিত পিতা কিইবা করিতে পারেন? হুমায়ুনের ভৃত্য জৌহর সেখানে উপস্থিত ছিল, সে এই দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেঃ হুমায়ুন জৌহরকে এক পেটিকা রৌপ্যমুদ্রা, একটি রৌপ্য বাহুবলয় এবং একটি কস্তুরী আনিতে বলিলেন। যাহাদের নিকট হইতে সেই রৌপ্যমুদ্রাগুলি পূর্বেই আনা হইয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া দিতে বলিলেন (উপহার দানের সুবিধাজনক প্রথা), একটি পোরসিলিনের পত্রে সেই কস্তুরীটি চূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রধান অনুচরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে এই উপহারই মাত্র দিতে পারি। আজ যেমন এই কস্তুরীর গন্ধে সমগ্র শিবির ভরিয়া গিয়াছে, আমার বিশ্বাস একদিন তাহার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে।" শিশুর নাম রাখা হইল আকবর। ১৫৪২এর তেইশে নভেম্বর তাঁহার জন্ম।

স্ত্রীপুত্রকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করিবার আনন্দ কিন্তু হুমায়ুন পাইলেন না। তিনি তখন অভিযানের আয়োজন করিতেছেন এবং জুন নগরী অধিকার না করিয়া থামিলেন না। অতর্কিত আক্রমণ হাত হইতে মুক্তি পাইয়া এতদিনে শিবিরের নিরাপত্তা আসিল। অবশেষে আঠাশে ডিসেম্বর হামিদা ও তাঁহার পুত্র উপনীত

হইলেন। হুমায়ুন এই প্রথম পুত্রকে দেখিলেন। পব বৎসর জুলাই মাস পর্যন্ত তাঁহাব পববর্তী কর্মপন্থা চিন্তা কবিতে জুন নগরীতেই থাকিলেন। তাঁহাব রাজ্য পুনরুদ্ধারেব প্রতিজ্ঞা তিনি কখনও ত্যাগ কবেন নাই, কিন্তু নিঃসন্দেহে, পুত্রেব জন্ম তাঁহাব অভিপ্রায়কে আবো দৃঢ়তা দিয়াছিল। যদিও তাঁহাব যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল, এবং পিতার মত বণবিশাবদও ছিলেন না, তবুও তাঁহাব উদ্দেশ্য সিদ্ধিব মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল, অবস্থা যত সঙ্গীন হউক না কেন। তিনি চিবকালই সিন্ধুদেশেব মরুভূমিতে বিচবণ কবিতে পাবেন না। তবে কি তিনি কান্দাহাবেব জন্য চেষ্টা কবিবেন? একবাব সেখানে পৌঁছাইতে পাবিলে পাবস্যেব শাহেব সাহায্য পাইতে পারেন। তবে সেখানে আবাব দুইভাই আছেন: কামবান এবং আস্‌কাবি—তাহাদের সহিত যুঝিতে হইবে। কামরান কাবুলের শাসক, ছোটভাই আস্‌কারি কামবানেব অধীনে কান্দাহাব প্রদেশ অধিকার কবিয়াছেন। তাহাদেব অভিপ্রায় সন্দেহজনক, কিন্তু বিপদেব সম্মুখীন হইতেই হইবে। তাঁহাব সম্মুখে দীর্ঘপথ; তাঁহাকে সিন্ধুনদ পাব হইয়া বেলুচিস্থানেব পার্বত্য বাধাব মধ্যে পথ খুঁজিতে হইবে। হুমায়ুন কান্দাহাব প্রদেশের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু পৌঁছিয়াই হঠাৎ বড় দুঃসংবাদ পাইলেন। তাঁহার ভ্রাতা আস্‌কারি তাঁহাব সৈন্যদল অপেক্ষা বিপুল সৈন্য লইযা তাঁহাকে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। পলায়ন ছাড়া অন্য কোন পথ নাই, আব নষ্ট কবিবাব মত সময় নাই। দ্রুত পবামর্শ হইল। এতদূর পর্যন্ত শিশু আকবব তাঁহাব মায়ের কোলে আসিয়াছেন: কিন্তু আফগানিস্থানের এই পার্বত্যপ্রদেশে যেখানে তাপ ও শৈত্য দুইই চরম একবৎসরের শিশুব পক্ষে তাহা মারাত্মক হইতে পারে। এখন

তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতগতিতে যাইতে হইবে। শিশুকে জৌহরের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অশ্বের সংখ্যাও বেশী নাই, হামিদাকে হুমায়ুনের সহিত এক অশ্বে আরোহণ করিতে হইল। সৈন্যগণ পর্বতের মধ্যে লুকাইল, কিন্তু সৈন্যগণ তখনও বোধকরি সবাই অপসরণ করিতে পারে নাই, আস্কারি তাঁহার সৈন্য লইয়া শিবিরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র বন্দী হইল।

যদি আস্কারি ভবিষ্যৎগণনার জন্য কিছু আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন (এশিয়ার রাজপরিবারের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণের ইহা একটি প্রিয় অভ্যাস) এবং ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাইয়া দিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'দৃঢ় নিশ্চিত' হইতে চাহিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই আগ্রহ দমন করিয়াছিলেন ; কিংবা এও হইতে পারে যে তিনি সেই সবল শিশুটিকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কান্দাহারে গেলেন। সঙ্গে রহিল বিশ্বাসী ভৃত্য জৌহর। সেখানে তাহার প্রতি ব্যবহার ভালই হইল।

এদিকে হুমায়ুন, তাঁহার বালিকাবধূ এবং চল্লিশজন অনুচর সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিতেছেন। হুমায়ুন স্থির করিলেন তিনি পারস্যে পলাইয়া গিয়া শাহের সাহায্য লইবেন। তিনি এই ব্যাপারে পারস্যের রাজার সহিত যোগাযোগ করিয়া সৌজন্যপূর্ণ উত্তর পাইয়া দীর্ঘ যাত্রার পর পারস্যের কাজভিনে পৌঁছিলেন। এই সুদূর উত্তর-পশ্চিমে শাহ্ তাহ্মাস্পের রাজধানী। শাহ্ তাহ্মাস্প্ হুমায়ুনকে যত্নের সহিত সম্বর্ধনা করিলেন। কিন্তু যখন হুমায়ুন সেখান হইতে যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না, তখন এই পলাতক রাজার প্রতি সেবাযত্নে কিছুটা ভাঁটা পড়িল। প্রায় এক বৎসর হুমায়ুন পারস্য সভায় পড়িয়া রহিলেন।

দীর্ঘকালের কষ্টসাধ্য ভ্রমণ, পর্বত ও মরুভূমিতে কঠিন পরিশ্রমের পর এই বিলাসী এবং রুচিবান্ রাজসভায় বাস এই মুঘলরাজার মনে গভীর ছাপ ফেলিয়াছিল। বাবরও ইতিপূর্বে পারস্যের হেরাট-এর উজ্জ্বল সংস্কৃতিব প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় হেরাটে পারসিক কলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। হুমায়ুন স্বভাবে ছিলেন পুস্তক এবং অধ্যয়নপ্রিয়, শিল্পরসিক। তিনি কাজভিনে যাহা দেখিতেছিলেন তাহা তাঁহারও আশা। তিনিও ভাবিতেন একদিন দিল্লীতে তাঁহার চারিদিকে বসিবে কবি, রসিক, পণ্ডিত এবং শিল্পী। যাহাকে ভাবতীয় চিত্রকলায় মুঘল চিত্রকলা বলা হয়, আকবর রাজা হইবার পর যাহা এত যত্নে লালন করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ভব হইয়াছিল হুমায়ুনের পারস্য আগমনের ফলে। শাহ্ তাহ্মাস্প্ যদিও বড় সম্রাট ছিলেন না, তিনি শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পারস্যের কয়েকজন অতি বিখ্যাত শিল্পী তখন তাবরিজে কাজ করিতেছিলেন।

১৫৪৪ এর শেষ দিকে পারস্যরাজ হুমায়ুনকে তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে হুমায়ুন তাঁহার রাজসভা হইতে চলিয়া আসিলেন। এক বৎসরের মধ্যে কান্দাহারেব পতন হইল। হুমায়ুন আস্কারিকে ক্ষমা করিলেন। এইবার তিনি গেলেন কাবুল অভিযানে। ভাই কামরান শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, হুমায়ুন সেইস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শিশু আকবর তখন কাবুলে, তাঁহার জননীকে কান্দাহারে রাখিয়া আসা হইয়াছিল, তাঁহাকে এবার আনা হইল। তিনজন আবার একত্র হইলেন। হুমায়ুনের বিপদ শেষ হয় নাই, তাঁহার অবস্থা তখনও নিরাপদ নয়। কামরান একদিকে যেমন

কপট আত্মসমর্পণ এবং শান্তি স্থাপন কবিতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে কখনও প্রকাশ্যে হিংস্রশত্রুতা, কখনও গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে-ছিলেন। হুমায়ুন কাবুলে ছিলেন নয় বৎসব: তাঁহাব দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত ভাবত পুনরুদ্ধাবেব জন্য সৈন্যসংগ্রহ কবিবার এবং সেই রাজ্যেব উত্তরাধিকাবী আকবরকে শিক্ষা দানেব এই সময়টুকু মিলিয়াছিল।

শিক্ষাদান? শিক্ষক রাখিয়া দেওয়া এক কথা আব ছাত্রকে শিখানো আব এক কথা। আকববেব ন্যায় অবাধ্য ছাত্র সংসারে কখনও হয় নাই। একাদিক্রমে চাবজন শিক্ষক যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালকটি বর্ণপবিচয় পর্যন্ত শিখিলেন না। হুমায়ুনের রুচি ছিল পাণ্ডিত্যে, তিনি বিবক্ত হইতেন। পুত্রকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহার আলস্যের জন্য ভৎর্সনা কবিতেন, তাঁহাকে ভাল কথায় উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল সামান্য, আকবর আমুদে এবং ইস্কুল-পালানো বালকই রহিয়া গেলেন। একেবারে জন্মের প্রথমদিন হইতে তাঁহার দিন কাটিয়াছে বিপদ, বিভীষিকা এবং ভয়াবহ কাজের মধ্যে, বাহিবের জগৎ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামে তিনি ডুবিয়াছিলেন। অশ্ব, কুকুর ও উট প্রভৃতি পশুদের তাঁহার ভাল লাগিত, তিনি পায়রা উড়াইতে দক্ষ ছিলেন এবং পায়রা উড়ানোর খেলা তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। অশ্বারোহণ, পোলো খেলায় এবং অসিযুদ্ধে সুনিপুণভাবে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, স্বভাবগুণে তাহাতে দক্ষতাও অর্জন করিয়াছিলেন। লক্ষ্যভেদেও তিনি ছিলেন চমৎকার। আমাদের ইংলিশ্ স্কুলের ক্রীড়ামুখী বালকগণের যেমন সকল প্রকার মানসিক চিন্তার প্রতি বিরাগ, আকবরের পড়াশুনার অনিচ্ছা কিন্তু

সেই প্রকৃতির নহে। বরং তিনি অন্যের পড়া শুনিতে ভালবাসিতেন, তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ফলে পারসিক কবিদের বিশেষত সুফী মরমীদের সমস্ত কবিতা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

হুমায়ুন পুত্রকে চিত্রকলাও কিছু শিখাইয়াছিলেন। ১৫৫০এ কাবুলে মীর সয়ীদ আলি এবং আবদাস সামাদ নামক দুইজন উচ্চশ্রেণীর তরুণ পারসিক চিত্রশিল্পীকে কাবুলে আমন্ত্রণ করেন। ইঁহারা তাঁহাব রাজসভার প্রধান শিল্পী ছিলেন এবং পরে দিল্লীতেও গিয়াছিলেন। হুমাযুন ও বালক আকবব উভয়েই পারসিক রীতির চিত্রাঙ্কনের কিছু পাঠ লইয়াছিলেন। তেহারানের গুলিস্তাঁ পাঠাগাবে আবদাস সামাদ অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র চিত্র আছে তাহাতে দেখা যায় যে আবদাস সামাদের সহকারীদের সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজপুত্রটিও আছেন, ছবিটির অন্য এক অংশে তিনি এই দৃশ্যের স্মরণে একটি ড্রইং সম্রাটকে উপহার দিতেছেন দেখা যায়। এই সময়, হুমায়ুন ভারতসিংহাসন উদ্ধাবের স্বপ্নমগ্ন ছিলেন। তাঁহার বংশগর্বে গর্বিত হইয়া একটি চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে তৈমুববংশীয় বাজপুত্রগণ এবং স্বয়ং তৈমুর। পারসিক শিল্পীরা বড় উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাহার পটভূমিকা হইল, পর্বতের উপরে বসন্ত আসিয়াছে, বক্রগতি স্রোতস্বিনীর ধারে ডালিম গাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে, সোনালি আকাশ, আর দীর্ঘ পল্লবঘন চীনার গাছের মর্মরিত পত্ররাশি। সুঠাম রক্তস্তম্ভের উপর স্থাপিত অলিন্দে হুমায়ুন বসিয়া আছেন, তাঁহার বিপরীত দিকে তাঁহার ভয়ঙ্কর পূর্বপুরুষ তৈমুর, আর নীচে অর্ধচক্রাকারে বসিয়া আছেন তৈমুর বংশজাত হুমাযুনের পূর্বজগণ। পরবর্তীকালে একজন হিন্দু চিত্রকর তৈমুরের ছবি মুছিয়া দিয়া আকবর ও তাঁহার পুত্র-

পৌত্রগণের ছবি বসাইয়া দিয়াছিলেন। ছবিটি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে।

এইভাবে কাবুলে শান্তিপূর্ণ উদ্যোগে, মধ্যে মধ্যে ভয়ে এবং অভিযান করিয়া কয়েক বৎসর কাটিল। যতদিন না সেই চির ঈপ্সিত হিন্দুস্থানের অভিযানের পরিকল্পনা সফল হইবার শুভ মুহূর্ত আসে ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

১৫৫৪-এর নভেম্বর মাসে হুমায়ুন ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আকবরের বয়স এখন বারো। সিন্ধুনদ পার হইবার পর পিতাপুত্রে গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ায় কথোপকথন হইল। অভিযানের সাফল্য কামনা করিয়া ঈশ্বরের আশীবাদ প্রার্থনা করা হইল। দিল্লীর রাজা শলিম শাহ স্থর সেই বৎসর মারা গিয়াছিলেন। এখন যিনি নূতন রাজা তিনি তাঁহার চেয়ে অনেক দুর্বল। হিন্দুস্থান এখন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ; এখন অদৃষ্ট আফগানের প্রতি অপ্রসন্ন। অতএব কাল অনুকূল। হুমায়ুন নিজে বড় সেনাপতি নন, তিনি তাই বৈরাম খান নামে একজন যুবক চরিত্রবান উপযুক্ত সৈনিকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তিনিই সৈন্য পরিচালনা করিবেন।

অভিযান সফল হইল। ১৫৫৫র গোড়ায় হুমায়ুন লাহোর অধিকার করিলেন। আর জুন মাসে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে দিল্লী জয় করিলেন। এই জয়ের গৌরব বালক আকবরকে অনেকে দিয়াছেন। অবশেষে হারানো সিংহাসন ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন সিংহাসন ভোগ করা হুমায়ুনের হইল না। বৈরাম খানকে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া আকবরকে তাঁহাদের সহিত পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দিলেন। হুমায়ুন রহিলেন রাজধানীতে। মুঘল শাসন নিরাপদ ও ভয়মুক্ত করিতে হইলে অনেক কিছু করিতে

হইবে। হুমায়ুন প্রধান শহবগুলিতে তাঁহার সৈন্যদের ছাউনীর ব্যবস্থা করিতেছিলেন। শাসন প্রণালী নির্ণযে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় ১৫৫৬ অব্দেব এক শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলা, তখন সবে সন্ধ্যার আজান শুনা গিয়াছে। মিনারের ছাদে যেখানে তাঁহার পাঠাগাব ছিল সেইখান হইতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাব মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল।[১] তিনদিন পবে তিনি মাবা গেলেন।

আকবর তখন ছিলেন কালান্থরে। সেখানে তাঁহার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন। সেই স্থানেই এক উদ্যানে তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত কবা হইল। সেই সিংহাসনটি এখনও আছে।

১ ত্যু-আরিক-এর সম্পাদক, মিষ্টার পেইন মনে করেন যে সম্ভবত হুমায়ুনের মৃগী ছিল এবং তাহার ফলেই তিনি পড়িয়া যান।

৫

তাঁহার পিতামহের মতই আকবর যখন রাজা হইলেন তখন তিনি বালকমাত্র। কিন্তু এই সিংহাসনের জন্য এই বয়সেই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইল। অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন। একজন হইলেন শিকান্দার সুর, ইনি সুযোগ্য শাসক শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইহাব বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে বৈরাম খান ও আকবরকে পাঠানো হইয়াছিল। আরো ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন হিমু নামে এক হিন্দু। হিমু তাঁহার প্রভু মুহম্মদশাহ আদ্দিলের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। মুহম্মদশাহ আদ্দিল কিছুকালের জন্য দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত হন। হিমু ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি মুঘল সৈন্যদের পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন এবং এই জয়গৌরবে স্ফীত হইয়া নিজেকেই রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। অবস্থা তখন খুবই জটিল। কিন্তু হিমুকে বৈরাম খানের সহিত যুঝিতে হইল। বৈরাম খানকে অনেকে কাবুলে পশ্চাদপসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিল কিন্তু তাহা তিনি শুনিলেন না। আকবরকে সঙ্গে লইয়া প্রতিপক্ষের বিশাল, উন্নততর সৈন্যদল ও হস্তীবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন পাণিপথেব প্রান্তরে। এইখানেই বাবর দিল্লীর সিংহাসন জয় করিয়াছিলেন। একটি তীর আসিয়া হিমুর চোখে বিদ্ধ হইল, তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হিমু বন্দী হইলেন। বৈরাম খান সেই হতভাগ্য বন্দীকে হত্যা করিবার জন্য আকবরকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বালক একজন অসহায় ও আহত ব্যক্তির উপর অসি চালনা করিতে সঙ্কোচ বোধ

কবিলেন। দিল্লী ও আগ্রা আবাব দখলে আসিল। শিকান্দার সুবকে এইবাব আক্রমণ কবা হইল। দীর্ঘকাল বাধা দেবার পব ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আত্মসমর্পণ কবিলেন। ইতিমধ্যে সিংহাসনেব দাবীদাবেবা হয মাবা গিযাছেন, নয তাঁহাদের উৎসাহ কমিযা গিযাছে। আকবব এখন স্বাধীনভাবে শাসন কবিতে পাবিবেন, বাজ্যগঠন কবিতে পাবিবেন।

আকববেব শাসনেব প্রথম কযেক বৎসব তাঁহাব শিক্ষা চলিতে লগিল। দৈহিক শিক্ষা এবং অন্যান্য সর্বপ্রকাব সূক্ষ্ম ব্যাযামে তিনি আনন্দ বোধ কবিতেন কিন্তু এখনও পডিতে শিখিতে চাহিলেন না। কানে শুনিযা জ্ঞান সংগ্রহ কবাই ভাল মনে কবিলেন। এই সময় যাঁহাবা কাছাকাছি ছিলেন তাঁহাদেব মনে হইযাছে, তিনি স্বাস্থ্যবান, ক্রীডাকুশলী, জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ কবিতেছেন, শিকাব ও ক্রীডাব ভক্ত, বাজনীতি, অর্থনীতি ও শাসনব্যাপারে তাঁহার মনোযোগ যৎসামান্য। এই সমযেব একটি ছবি পাওযা গিযাছে। তাঁহাকে পাশ হইতে দেখা যাইতেছে, মসৃণ গাল ও ওষ্ঠাধব, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, চোখে প্রাণেব উত্তাপ, পরনে একটি স্বল্পবক্তিম কোট, তিনি নাকেব নিকটে আনিযা একটি ফুলেব ঘ্রাণ লইতেছেন। তাঁহাব সম্মুখে নীল আকাশ এবং ধূ ধূ বিস্তীর্ণ প্রান্তব। বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁডানো বা নিজেকে উপস্থিত করাব বিশেষবীতি তখনকার প্রচলিত প্রথা ছিল, কিন্তু এই ছবিটি দেখিযা মনে হয একটি সত্যই সুখী আগ্রহী যুবক, তাহাব সম্মুখে পড়িযা রহিয়াছে বৃহৎ সংসার।

যদিও তাঁহাকে বাজনীতিব প্রতি উদাসীন মনে হইত, তবুও, আবুলফজলেব মতে, তাঁহাব মন ছিল কর্মব্যস্ত। তখনকার রাজ-সভায় যে ষড়যন্ত্র এবং পাল্টা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহার মধ্যে

আকবর কূটদৃষ্টিতে তাঁহার সমর্থকদের খুঁজিয়া লইতেন এবং তাহাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরঙ্গভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র বস্তু খুঁজিয়া পাইতেন, তাহা হইল তাঁহার বাহিরের কর্মচঞ্চল উত্তাপের অন্তরালে এক আশ্চর্য বিষাদ বহনের ক্ষমতা। চৌদ্দবৎসর বয়সেই মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সংসারের প্রতি এক প্রচণ্ড বিমুখতা দেখা দিত। ১৫৫৭র একদিনে তাঁহার মনে এইরকম একটি ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার চতুর্দিকে ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের উপস্থিতি, তাহাদের একমাত্র চিন্তা এই সংসার, এই ক্ষণভঙ্গুর জগৎ। তিনি ক্রোধে ও অধৈর্যে তখনই ইরাকী অশ্ব প্রস্তুত করিতে বলিলেন। এই অশ্বগুলি দ্রুতগতি ও রুক্ষ মেজাজের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার প্রিয়ও বটে। সঙ্গে কাহাকেও লইলেন না, একজন সহিসকেও নয়, ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান আগ্রা হইতে নির্জন প্রান্তরের দিকে চলিলেন, সমস্ত মানব সংসার হইতে দূরে একাকী থাকিবার বাসনা তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

দৃষ্টির বাহিরে গিয়া নির্জন প্রান্তরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি 'ঈশ্বরের সহিত মিলিত' হইলেন। প্রচণ্ড অশ্ব তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া ছুটিতে ছুটিতে বহুদূরে অদৃশ্য হইয়া গেল। আকবর একাকী সেই প্রান্তর মধ্যে এক দিব্য আনন্দে ডুবিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁহার হৃদয় আবার সহজ এবং সজীব হইয়া উঠিতেই তিনি সম্বিৎ পাইয়া চারিদিকে চাহিলেন। তিনি তখন পরিপূর্ণ নির্জনতার মধ্যে, চারিদিকে শুধু নীরব মৌনতা। তাহাকে দেখিবার মত একজন ভৃত্য নাই, তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একটিও অশ্ব নাই। কিছুক্ষণ তিনি হতবুদ্ধি হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাহার পর দেখিলেন বহুদূর হইতে তাঁহার অশ্ব হৈরণ তাঁহার দিকে আসিতেছে। সে নিকটে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তরুণ রাজা চমৎকৃত হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ইহা তাঁহার কাছে এক রহস্যময় ভগবৎ নির্দেশ মনে হইল যে তিনি আবার সংসারে তাঁহার প্রিয় পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন।

চৌদ্দ বৎসরের বালকের জীবনে ইহা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তবে আকবর এই বয়সেই পারস্যের মরমীয়া কবিদের কবিতায় ডুবিয়া আছেন, কাবুলে থাকিবার সময়ই তাহাদের মুখস্থ করিয়াছেন। এই মরমীয়াবাদ তাঁহার মানসপ্রকৃতির কাছে ভাল লাগিয়াছিল। আমরা লক্ষ্য করিব যে এই ঘটনাটি পরবর্তী আরো অনুরূপ ঘটনার সূচনা মাত্র।

তিনি আবার ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হইলেন, এবার বিশেষ করিয়া হস্তী ক্রীড়ায়। কাবুলে তিনি পাইয়াছিলেন কুকুর, অশ্ব এবং উষ্ট্র ; ভারতবর্ষে পাইলেন নূতন একটি পশু। তাহাকেও বশ করিতে হইবে। পশুটি এত প্রকাণ্ড, শক্তিশালী, এত বড় আয়তন লইয়াও চালচলনে এত ক্ষিপ্র, তাহার এত বুদ্ধি—আকবর বড় আনন্দ পাইতেন। আর যদি হিংস্র, ভয়ানক ও হত্যাকারী হইয়া ওঠে—তাহাহইলে এই পশুই ত বশ করিবার, নিজের ইচ্ছার নিকট নত করিবার উপযুক্ত। যদি কখনও কোন হস্তী তাহার মাহুতকে হত্যা করিত, লোকজনের উপর অত্যাচার করিত, সকলের ভয়ের পাত্র হইয়া উঠিত, আকবর "তাঁহার উদ্যান ও প্রাসাদ প্রাঙ্গণের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে" হস্তীটির দাঁতের উপর পা রাখিয়া সহাস্যবদনে পিঠে উঠিয়া বসিয়া আর একটি

কলহপরায়ণ হস্তীর সহিত তাহার যুদ্ধ বাধাইয়া দিতেন। যখন দেখিতেন যে অন্যহস্তীটির মাহুত তাহাকে আর বশে আনিতে পারিতেছেনা তখন তিনি নিজের হস্তী হইতে সেই হস্তীটির উপর লাফাইয়া পড়িতেন। এইরূপ বিস্ময়কর কুশলতা, সাহস এবং ক্ষিপ্রতার কথা আবুলফজল লিখিয়াছেন। আর সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মস্মৃতিতে পিতার বন্য এবং অবাধ্য হস্তীদের বশে আনিবার অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আকবরের এই ক্ষমতা সকলেরই চমৎকৃতি এবং প্রশংসার বিষয় ছিল। কিন্তু কখনও কখনও ভয়ের কারণ হইত। এইরূপ কোন ঘটনায় বৈরাম খান আল্লাহ তরুণ সম্রাটের জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিংহাসনের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সমস্ত অমঙ্গল দূর করিবার জন্য উপহার বিতরণ করিয়াছিলেন।

বৈরাম খান শিয়াসম্প্রদায়ের লোক। শিয়ারা পারস্যের রক্ষনশীল সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে প্রধান সম্প্রদায় ছিল স্থন্নী। স্থন্নীরা তাঁহাকে অপছন্দ করিত। কিন্তু রাজার রক্ষক হিসাবে তাঁহার আরো প্রত্যক্ষ শত্রু হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহার শত্রুর জন্য লুব্ধ ছিলেন, সম্রাটকে তাঁহাদের নিজেদের প্রভাবের মধ্যে আনিতে চাহিতেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজে তখনও যুবক এবং হয়ত নিজের ব্যাপারে তাঁহার আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। সম্ভবত তিনি উচ্চাভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। তাঁহার সর্বাপেক্ষা তীব্র শত্রু ছিলেন রাজসভার অনেক মহিলা। হিমুর মৃত্যুর পর তাঁহাদের কাবুল হইতে ভারতবর্ষে আনা হইয়াছিল। রাজমাতা হামিদার বয়স এখন তিরিশ, জীবনের বহু দুঃখকষ্টের পর সাফল্য আসিয়াছে।

পুত্রেব সিংহাসনের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এখন তিনি যে ক্ষমতার নব আনন্দেব স্বাদে খুব কুণ্ঠিত ছিলেন তাহা বলা চলে না। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন, প্রধান হইলেন আকবরের মুখ্যধাত্রী মহম অনগ। তাঁহাব পুত্র আদম খাঁকে তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মহম অনগেব ছিল প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নীতি বলিয়া কোন জিনিস তাহাব ছিল না।

হুমায়ুনের সিংহাসন যিনি জয় কবিয়া দিয়াছিলেন তিনি বৈরাম খান। তাঁহাব নৈপুণ্য এবং চালনা শক্তি ছাড়া আকবর তাহা রক্ষা করিতে পাবিতেন কিনা সন্দেহ। আকবর স্বভাবে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু নিজেব যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁহার উপরে যে সব বিধিনিষেধ চাপান হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া তাঁহাকে যে স্বল্প অর্থ দেওয়া হইত, তাহার জন্য তিনি বিরক্ত হইতেন। পরবর্তী তিনবৎসরে এই বিরূপতা আরো বাড়িল, বিশেষ করিয়া রাজপুবীব মহিলাবৃন্দ ইহা বাড়াইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বৈরাম ইহাতে বড় আহত হইলেন। তিনি বক্ষক, নিজেকে রাজার পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন, তিনি শক্তিমান্ নিজের শক্তির উপর আস্থাও আছে। আর এক যুবক সম্রাট, তিনিও দৃঢ় প্রকৃতির, নিজের রাজ্যের পূর্ণ উত্তরাধিকার পাইতে ব্যগ্র। কাজেই তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িল। রাজসভায় ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, বৈরামের বিরুদ্ধে বহু গোপন অভিযোগ আনা হইতে লাগিল। ১৫৬০ এ ব্যাপারটি চরমে উঠিল। আকবরের বয়স তখন আঠারো।

প্রধানধাত্রী মহম অনগ এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ছিলেন। তিনি বার বার আকবরকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন যে তুমি বৈরামকে লিখ যে রাজ্যের ভার এখন হইতে আমি নিজের হাতে

লইলাম, আর বৈরাম "এতদিন ধরিয়া যাহা চাহিতেছিল" সেই মক্কায় তীর্থ যাত্রা করিতে বল। এইভাবে বৈরামকে অসম্মানিত করা হইল। আরো বিশ্রী ব্যপার হইল বৈরামের এক অবাধ্য-ভৃত্যকে একদল সৈন্য লইয়া অনুসরণ কবিয়া "মক্কায় পাঠাইয়া দিতে" নির্দেশ দেওয়া হইল। ইহাতে বৈরাম ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করিলেন। বৈবাম পরাজিত হইয়া আকবরের সম্মুখে বন্দীভাবে আনীত হইলে আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং পদবী অনুসারে আয়োজন করিয়া মক্কাযাত্রার জন্য যথেষ্ট ধন দৌলত দেওয়া হইল। তিনি সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু তাঁহার তীর্থ কবা হইল না। পাটনে একদল পাঠানের আক্রমণে তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁহার চারবৎসরের সন্তান, আবদুর রহিমকে রাজপুরীতে আনা হইল। তিনি আকবরের রক্ষণাবেক্ষণে মানুষ হইতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার সভাসদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট আকবর প্রচুর ঋণী। তাঁহার প্রতি এই অবহেলাময় ব্যবহারে আকবরের মনে এক বিষাদজনক অনুভূতি হইয়াছিল। বৈরাম ছিলেন সাহসী, প্রভুভক্ত, তাঁহার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কখনও কখনও তিনি উদ্ধত আচরণ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তিনি রাজপুরীর ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি ও বিদ্বেষপবায়ণা রমণীদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইলেন।

মুহম অনগ তাঁহার বিজয়ে উল্লসিত হইলেন। কিছুকাল আকবর সম্পূর্ণই তাঁহার প্রভাবে পড়িলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য অতি উচ্চাভিলাষে সব কিছুর মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেন!

রণক্ষেত্রে তরুণ সম্রাটের ডাক আসিল। গোয়ালিয়ারের আত্মসমর্পণ এবং জৌনপুরের অন্তর্ভুক্তির ফলে আকবরের রাজ্যসীমান্ত সুরক্ষিত হইল। এইবার তিনি মালব জয় করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইলেন। মালবের রাজা সুরা, সংগীত ও সুরের প্রেমিক—রাজবাহাদুর। আকবর এই অভিযানের দায়িত্ব দিলেন মহম অনগের পুত্র আধম খানের উপর। রাজবাহাদুরের প্রিয়তমা পত্নী রূপমতীর রূপ ও লাবণ্য ছিল বিখ্যাত। তাঁহাদের প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিরা গান বাঁধিয়াছিলেন, বহু ভারতীয় চিত্রকর তাঁহাদের প্রেম-জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন। ছবিগুলিতে দেখি তাঁহারা কখনও চন্দ্রালোকে পর্বতের ধারে অশ্বারোহণে, কখনও বা পাহাড়ী নদীর তীরে বিশ্রামরতা। রাজবাহাদুব তাঁহার ভাগ্যনিয়ামক এই যুদ্ধের আগে ভারতীয় বীতি অনুসারে আদেশ দিয়াছিলেন যে যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইলে সুন্দরী রূপমতী যেন অন্য স্ত্রীগণের সহিত আত্মহত্যা করেন, যেন তাঁহারা শত্রুহস্তে না পড়েন। তিনি পরাজিত হইলেন। বিজয়ী সৈন্য যে মুহূর্তে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল, রূপবতী বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন কিন্তু তবু বাঁচিয়া রহিলেন। আধম খান তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন, তিনি নিজেই তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুরে লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রূপমতী বিষপান করিয়া মুক্তি পাইলেন। আধম খান অন্যান্য রমণীসকল এবং অধিকৃত ধনরত্ন আকবরের সভায় না পাঠাইয়া নিজের জন্যই রাখিয়া দিলেন এবং দানবীয় উল্লাসে বিজিত জনসাধারণকে হত্যা করিলেন।

আকবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত প্রতিবিধান করিলেন। ব্যস্ত ভাবে আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া মালব পৌঁছিয়া সেনাপতিকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি তখন 'বিভ্রান্ত প্রজাপতির মত'; বিনীত ভাবে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার জননী মহম অনগ সমস্ত ব্যাপাবটিকে সহজ করিবার জন্য দ্রুত দৌড়িয়া আসিলেন। সেবারের মত সফলও হইলেন। তিনি সন্তানকে ভৎর্সনা করিলেন, এবং সমস্ত ধনরত্ন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আধম খান শোধরাইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁহার মায়ের ভৃত্যদের উৎকোচ দিলেন। রাজবাহাদুরের হাবেম হইতে দুইটি সুন্দরী রমণী যখন আকবরের হারেমে পাঠানো হইতেছিল, তাহারা উৎকোচ পাইয়া তাহাদের চুরি করিবার সুযোগ করিয়া দিল। ভাবিয়াছিলেন, এখান হইতে অন্যত্র যাইবার সময়ে হট্টগোলের মধ্যে তাহা কাহারও চোখে পড়িবে না। কিন্তু তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। আকবর রমণীদের তলব করিলেন। মহম ভাবিলেন তাহারা সম্রাটের সম্মুখে আসিলে পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাই গোপনে তাহাদের হত্যা করিলেন। এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় এই মহিলাটির কী পরিমাণ প্রভাব এবং ক্ষমতা ছিল। আকবর এই নিষ্ঠুর হত্যায় কিছু বলেন নাই। সম্ভবত ঘটনাটি তিনি কোনদিন ভুলেন নাই।

মালব হইতে গৃহাভিমুখে রাজযানের সম্মুখে পথে হঠাৎ জঙ্গল হইতে পাঁচটি সন্তান লইয়া এক বাঘিনী দেখা দিল। একাকী আকবর তাহার সহিত যুঝিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ ভয়ে বিবর্ণ; ঘর্মাক্ত। আকবর তরবারির আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন।

এই সময়ে আকবরের একটি অভ্যাস হইয়াছিল। তিনি মধ্যে

মধ্যে ছদ্মবেশে প্রজাদের মতামত জানিবার জন্য বাহির হইতেন। একবার আগ্রার নিকটে তীর্থযাত্রী ও আরো বহু লোকের বিশাল সমাবেশ হইয়াছে। আকবব প্রজাদের চিন্তায় রাত্রিবেলা ভিড়ের মধ্যে গিয়াছিলেন। সেইখানে হঠাৎ তাঁহাকে একটি ভবঘুরে লোক চিনিয়া বসিল। আকবরও মুহূর্ত মধ্যে মুখের আকার বিকৃত করিয়া চোখ ট্যারা করিয়া চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিলেন। হা-ঘরের অনুমান লোকে ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিল। সম্রাট নিঃশব্দে পলায়ন কবিলেন।

এই নৈশ অভিযানগুলি আকবরের অসীম কৌতূহলের ফল। ইহা অবশ্য কৌতূহল অপেক্ষা কিছু বেশী। তিনি চারিদিকে তোষামোদকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা বেষ্টিত, তিনি নিজে যদি সন্ধান না করেন, প্রকৃত সত্য কিরূপে জানিবেন। তাঁহার বয়স এখনও কুড়ি হয় নাই কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন করিতে চান এবং ভালভাবেই করিতে চান। আর সেইজন্য প্রজাদের অবস্থা তাঁহাকে জানিতে হইবে। ক্রীড়া এবং মৃগয়ায় তাঁহার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁহাব সভাসদ্‌দের অগোচরে অনেক বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

মহম অনগ এখন নিজেকেই প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী মনে করিতেছিলেন। তবে ১৫৬১তে তিনি ও তাঁহার দল প্রচণ্ড বাধা পাইলেন। শামসুদ্দীন কাবুল হইতে আগ্রা আসিতেন এবং মহম এর আধিপত্য ডিঙাইয়া তাঁহার হাতে রাজনীতি, অর্থকোষ এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ঠিক একই সময়ে তাঁহার নৃশংসপুত্র আধম খানকে মালবের সরকার হইতে ডাকিয়া পাঠানো হইল।

তাঁহাকে চোখের সামনে রাখিয়া সংশোধন করিবার অভিপ্রায় আকবরের ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আগ্রায় আসিয়া তিনি কিছুদিনের মধ্যে চরম ক্রোধে এমন একটি কাজ করিয়া বসিলেন যাহা তাঁহাব পূর্ববর্তী ঔদ্ধত্যকেও ছাড়াইয়া গেল। ১৫৬১র মে মাসে একদিন আকবর অন্তপুবে ঘুমাইয়া আছেন, পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে নূতন প্রধান সচিব শামসুদ্দীন অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেছেন। হঠাৎ সেইখানে একদল অনুচর লইয়া আধম খান অত্যন্ত অশিষ্টভাবে প্রবেশ করিলেন। উচ্চৈস্বরে উদ্ধতভাবে শাসাইতে শাসাইতে অগ্রসব হইতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহাব দুই অনুচবকে ইঙ্গিত কবিতেই তাহারা তববাবী দিয়া শামসুদ্দীনকে আক্রমণ করিল। তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলে আবার আঘাত করা হইল এবং তিনি নিহত হইলেন। কোলাহলে আকববেব নিদ্রাভঙ্গ হইল। আধম খান এইবার আরো বড় হত্যা করিবার জন্য আকবরের ঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন। কিন্তু দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ, এবং প্রহরী রক্ষিত। সমস্ত ঘটনা আকবব শুনিলেন। তিনি অন্য পথ দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন শামসুদ্দীনের রক্তাক্ত মৃতদেহ বাহিরে পড়িয়া আছে।

দালানের উপর দুইজনের দেখা হইল। আধম সম্রাটের তরবারি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে একটি মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর, প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি সেই সংজ্ঞাহীন দুর্বৃত্তকে বাঁধিয়া উপর হইতে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। অনুচরগণ ভয় পাইয়া গিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে কাজ করিবার ফলে ভাল করিয়া কাজটি

হইল না। দেখা গেল নীচে পড়িয়াও আধম খানের নিঃশ্বাস বহিতেছে। তাঁহাকে আবার তুলিয়া আনিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া নিক্ষেপ করা হইল। তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল, মস্তিষ্ক ছড়াইয়া পড়িল।

আকবর হারেমে ফিরিরা গেলেন। মহম অনগ শুনিলেন তাঁহার পুত্র এক অন্যায় কাজের জন্য বন্দী হইয়াছে। তিনি রোগশয্যা ছাড়িয়া দীনভাবে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আকবর সংক্ষেপে বলিলেন, "আধম খান আমাদের মন্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে, আমরা তাহাকে শাস্তি দিয়াছি"। হতভাগিনী তখনও জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র মৃত। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "ঠিকই করিয়াছ।" কিছুক্ষণ পরে যখন জানিতে পারিলেন তখন জানিতে চাহিলেন "তাহাকে কি ভাবে হত্যা করা হইল।" অনুচরগণ বলিল, "আমরা জানি না, তবে তাঁহার মুখের উপর একটি পাঞ্জার ছাপ রহিয়াছে।" ছাপটি আকবরের মুষ্টির। সম্রাটের নিকটে গিয়া অনুযোগ করিবার সাহস মহমের হইল না। কিন্তু "অন্তর সহস্র যন্ত্রণার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল।" দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া রমণী কাঁদিলেন। তাঁহার রোগ বাড়িতে লাগিল। ছয় সপ্তাহ পরে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এতদিনে আকবর রাজ্যশাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন।

৭

এইভাবে, আকবর, আবুলফজলের ভাষায় 'অন্তরাল হইতে' বাহিরে আসিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যশাসন পরিচালনা গ্রহণ করিলেন। মহম অনগ ও তাঁহার দলের কার্যের ফলে যে দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাৎ করা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বন্ধ হইল। তবে তাহার পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতার মূলে যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তিরা সমর্থন এবং ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহাদের পরম উদারতায় আকবর ক্ষমা করিলেন। মুসলমান বিজেতাগণের মধ্যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসত্বে নিযুক্ত করিবার যে প্রথা চলিয়া আসিতেছিল এইসময় হইতে তাহা আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে ১৫৬২র গোড়ায় আকবর জয়পুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনিই আকবরের উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীরের জননী। এই বিবাহ ভারতবর্ষ ও তাহার অদৃষ্টের সহিত আকবরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীক। তিনি আর বিদেশাগত আক্রমণকারী মাত্র নহেন, তিনি ভারতবর্ষের দত্তকপুত্র। হিন্দু রাজকুমারী বিবাহের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে নানাদিক হইতেই ফলবান হইয়াছিল।

প্রায় এইসময়েই ভারতবর্ষের অতি বিখ্যাত গায়ক এবং সুরকার, গোয়ালিয়ারবাসী তানসেনকে রাজসভায় আহ্বান করা হয়। বিশেষ সম্মান এবং পর্যাপ্ত উপহার দিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। আকবর সঙ্গীত ভালবাসিতেন, বিশেষ যত্নে সঙ্গীত শিক্ষাও করিয়াছিলেন। তানসেন তাঁহার প্রিয়পাত্রে পরিণত হইল। বীরবল নামে আর একজন হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার

আকবরের অন্তরঙ্গ ও প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি বীরবলের রসিকতা ও গল্পগুজব শুনিতে ভালবাসিতেন।

আকবরের অন্তরে কিন্তু বড় আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সর্বদাই তাঁহার ধাত্রী মহম অনগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অযোগ্যপুত্রের বহু দোষ দেখিয়াও দেখেন নাই; তাঁহাকে প্রাপ্যের অধিক সুযোগও দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লোকই তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, তাঁহার জননী যে একেবারে নির্দোষ ছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? তিনি একের পর এক লোককে বিশ্বাস করিয়াছেন আর তাঁহারা বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শুধু নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। কিন্তু কী বিশাল ভার স্কন্ধে তুলিতে হইল! সত্য কোথায়? কীভাবে ঈশ্বর তাঁহাকে দেখা দিবেন? ছদ্মবেশে তিনি দীনতম প্রজাদের সহিত মিশিলেন। মৃগয়া ছাড়িয়া দিয়া ধূলিধূসরিত সন্ন্যাসী বা ফকিরের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের শুশ্রূষা কোথায় পাইবেন? পণ্ডিতদের নিকট প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাদের উপদেশ এক কথায় উড়াইয়া না দিয়া নীরবে শুনিলেন, কিন্তু বুঝিলেন উত্তরগুলি মূল্যহীন, শূন্যগর্ভ। এখন কুড়ি বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। সমস্ত সাফল্য ও জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি "অন্তরে এক জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন"। "আমার শেষযাত্রার জন্য কোন আধ্যাত্মিক পাথেয় নাই—তাই হৃদয় বিপুল দুঃখে রুদ্ধ।"

চতুর্দশবৎসর বয়স্ক বালকের জীবনে যে অলৌকিক অনুভূতি আসিয়াছিল, যখন তিনি জনতা পরিত্যাগ করিয়া বিজনতার মধ্যে

ছুটিয়া গিয়াছিলেন—সেই অনুভূতি তাঁহার বহুমুখী জটিল কর্মধারার অভিজ্ঞতা হইতে কত স্বতন্ত্র। ইহাতে বোঝা যায় যে তাঁহার অন্তরের কী প্রেরণা ছিল। সত্যের জন্য, আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য তাঁহার ছিল চিবঅতৃপ্ত তৃষ্ণা। শঠতা এবং ছলনা তাঁহার উপরে আদৌ প্রভাব ফেলিতে পাবে নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন আত্মার আশ্রয়, জানিতে চাহিয়াছিলেন ভগবৎ ইচ্ছা কি? সেই ইচ্ছানুসাবেই তিনি কাজ কবিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানেব অভিপ্রায় তিনি জানিবেন কী উপায়ে? ইহাই ছিল আকববের আমৃত্যু সন্ধান। যিনি সাম্রাজ্যেব ভাব একাকী বহন কবিতে-ছিলেন, কোটি মানুষেব সুখ-শান্তিব জন্য যিনি দায়ী ছিলেন, তিনি যদি মধ্যে মধ্যে গভীব অবসাদ বোধ করেন—তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে?

তাঁহাব অনেকগুলি বেহিসাবী দুঃসাহসী কাজে সভাসদেবা চিন্তিত ও ভীত বোধ করিতেন। হিংস্রতম ও দুষ্টতম হস্তীপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিয়া তাহার সহিত অন্য হস্তীব যুদ্ধ বাধাইয়া, নৌকা নির্মিত সেতুর উপর দিয়া প্রবলবেগে নৌকাগুলিকে প্রায় অর্ধমগ্ন করিয়া বিজয়ী হস্তী পৃষ্ঠে চাপিয়া যমুনাব পরপারে সেই পলাতক হস্তীটিকে অনুসরণ করিতেন। এই সমস্ত কাজ, যদি আমরা তাঁহার নিজের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করি, শক্তি ও নৈপুণ্যের শারীরিক উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত নয়, ইহার পশ্চাতে আরো কোন গভীর ব্যাপার ছিল। তাঁহার মৃত্যু কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? তিনি কি ঈশ্বরকে ব্যথা দিয়াছেন? তাঁহার আদেশ কি মান্য করেন নাই? তাহা হইলে বাঁচিয়া কি হইবে! কিন্তু তিনি প্রমাণ চান। যদি তাঁহার মৃত্যু ঈশ্বরের কাম্য হয়, তাহা হইলে এইসকল ভয়াবহ

কাজের মধ্যে যোগ দিয়া তিনি নিজেকে মৃত্যুর জন্য উৎসর্গ করিতেছেন। আর যদি তিনি তাহা সত্ত্বেও আশ্চর্যভাবে বাঁচিয়া যান, তাহা হইলে এই ত তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রমাণ।

লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার মধ্যে এই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। লোকে দেখিত, আমাদের যুবক রাজা পুরুষমানুষ বটে। তাঁহার অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা ছাড়াও তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহসিকতা, এবং কর্মে ক্ষিপ্রতা দেখিয়া সবাই অভিভূত হইতেন। সর্বোপরি হিন্দুমুসলমান উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিবার দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে, যাহারা তাঁহার কঠিনতম শত্রু হইতে পারিত, তাহাবা অনুগত প্রজায় পরিণত হইল।

তাঁহার বিজ্ঞ উদাব নীতিতে হিন্দুবা বড় সুখী হইল। ১৫৬৩তে আকবর মথুবায় বাঘ শিকারের জন্য গিয়াছেন। মথুবা পবিত্র স্থান, নানা অঞ্চল হইতে তীর্থযাত্রী আসে। আকবর জানিলেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে আগত যাত্রীদের উপর সরকারের কর ধার্য করিবার প্রথা আছে। তাহাতে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা কর আদায় হয়। তিনি ইহাতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। হিন্দুদের উপাসনা প্রথা ভুল হইতে পারে, কিন্তু তীর্থযাত্রীরা ভগবানের পূজা করিতেই আসে, তাহাদের উপর কর-ধার্য করা নিশ্চয়ই ভগবানের কাছে প্রীতিকর কার্য নহে। এইসময় হইতে সমগ্র সাম্রাজ্যে এই কর তুলিয়া দেওয়া হইল। এই কাজে উল্লসিত হইয়া তরুণ সম্রাট একদিনে মথুরা হইতে আগ্রা ছত্রিশ মাইল পথ হাঁটিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে শুধু তিনজন সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত অবস্থায় আগ্রা পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহার রাজসভার

অনুচরগণকে শারীরিক শক্তিতে অনেকদূর ছাড়াইয়া গেলেন ; আর মানসিক শক্তিতে আরো বহুদূর।

পরবৎসরের গোড়ায়, এই উদার মনোভাবের প্রেরণায় একুশ বৎসর বয়সের উর্ধ্বের অমুসলমান পুরুষদের উপর যে কর ছিল তাহা তুলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। ইহার জন্য রাজস্বের বিরাট অংশ ত্যাগ করিতে হইল। ইহা ভারতবর্ষে মুসলমান বিজেতাগণ শত শত বর্ষের প্রথায় ঐতিহ্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আকবরের বিবেক ইহার প্রতিবাদ করিল। ইহার জন্য তাঁহাকে উপদেষ্টা-মণ্ডলী, তাঁহাব মা এবং পরিবারের অনেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবকের এই কাজ সত্যই বিস্ময়কর।

আমাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে, সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে প্রথা-গুলির শক্তি অসীম। আমাদের অন্ধ করিয়া দিতে ইহাদের শক্তি অমেয়। প্রত্যেক যুগই বিস্মিত হইয়া ভাবে, পূর্ববর্তী যুগে মানুষ কেমন করিয়া প্রবল অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে কোনরূপ অন্যায় মনে না করিয়া মানিয়া লইয়াছে, সমর্থন করিয়াছে। ইহা শুধু আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সম্বন্ধেই সত্য নয়, ইহা আমাদের পক্ষেও সত্য। আমরাও জগতের এই ধারা মানিয়া লইয়াছি।

আগেই বলিয়াছি যে তরুণ আকবর নিজের সম্বন্ধে দ্বিধায় অন্তরের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইতেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টায় আকস্মিক এবং বিপুল দুঃখে আক্রান্ত হইতেন। আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের মধ্যে সার্বজনীনতার বোধ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল ; বয়স্কদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং প্রথাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

এইবার আমরা তাঁহাকে অন্যদিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার বহুমুখী প্রকৃতির আর একটি হইল তাঁহার অশান্ত রক্তধারা, পূর্বপুরুষদের মতই হিংস্র জীবনোল্লাস চরিত্রের মধ্যে অদম্য এক শক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি চিন্তাশীল, ততক্ষণ পর্যন্তই তিনি বিজ্ঞ, সহিষ্ণু, উদার, বহু দূবদৃষ্টিসম্পন্ন এবং চিন্তাগুলিকে সাহসের সঙ্গে কাজে পরিণত করিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি কর্মী হিসাবেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—নৃশংস শক্তির প্রমত্ততায় তিনি বর্বর কাজ করিতেও পারিতেন। সিংহাসনে তিনি ভাল ভাবে বসিয়াছেন, কোন উপদেষ্টার অধীন তিনি নন, এইবার রাজ্যজয় ও রাজ্য-প্রসারের জীবন শুরু করিলেন। এ জীবনের শেষ হইল তাঁহার মৃত্যুতে। আমার মনে হয়, কখনই তাঁহার মনে হয় নাই যে তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে এইরূপ একটি জীবন অসংগতিপূর্ণ। তিনি জানিতেন যে তিনি প্রজাদের শাসক, বিশ্বাসও কবিতেন যে তাঁহাব শাসন সহৃদয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি আরো বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে ভারতবর্ষে আনিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়া ভারতবর্ষের অদৃষ্টের সহিত নিজের অদৃষ্টকে তিনি ক্রমশই এক করিয়া লইতে মনস্থ হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে তিনি বিজেতা হিসাবেই ভারতসিংহাসন পাইয়াছিলেন এবং তৈমুরের রক্ত তাঁহার দেহে বৃথাই বহিতেছিল না। কাজেই তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি নির্দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ বিনাকারণে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন, এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের প্রথা বিনা প্রশ্নেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেহের মতই তাঁহার মনও ছিল চঞ্চল। তিনি ধর্মীয় চিন্তা ও

বিচারে আগ্রহী ছিলেন ; কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শিথিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত। এ ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ, রুচি বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। তাহা কোন সহজাত প্রতিভাজনিত নয়। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে যাহা দেখিতে পাই তাহা সত্যই প্রতিভার বিচ্ছুরণ। একজন জাত চিত্রকর যেমন চিত্রেই ডুবিয়া থাকেন, একজন সুরস্রষ্টা যেমন সুরে ডুবিয়া থাকেন, সেইরূপ আকবর কর্মের বিহ্বল আনন্দে ডুবিলেন। এখানে তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ নিশ্চিত, সহজাত ক্ষমতার দ্রুত বিচ্ছুরণ। আর জগতে যে সব ব্যক্তি কর্মের প্রতিভা ও আগ্রহ লইয়া জন্মান, তাঁহাদের প্রচণ্ড ও অদম্য শক্তির বাহির হইবার বেশী পথ না থাকায় অন্য মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের দ্বন্দ্ব বাধে, অন্যকে অবনত ও পরাজিত করিবার ইচ্ছা তাঁহাবা মন হইতে বাদ দিতে পারেন না।

আমাদের একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। তাঁহার সহজাত রণজয় বাসনা তৃপ্ত হইলে আকবর আবার তাঁহার অন্যসত্তায় ফিরিয়া আসিতেন, তখন তিনি মানবিক, উদার। তিনি যেসকল প্রদেশ জয় করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার শাসন মানিয়া লইয়াছিল, অধীনতায় অসুখী বোধ করে নাই। সীজারের গল বিজয়ের সহিত তুলনা করিতে পারি। জয়ের সময় ধ্বংসলীলা ও রক্তপাত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহার পরিণাম রমণীয় হইয়াছিল। তবে আমাদের সহানুভূতি সীজার অপেক্ষা ভ্যারসিঁগেতোরি-র প্রতি বেশী। আকবর অপেক্ষা দুর্গাবতীর প্রতি বেশী।

দুর্গাবতী ছিলেন গণ্ডদেশের শাসক ও রাণী। তিনি ছিলেন বীরাঙ্গনা, বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, বহু যুদ্ধে জিতিয়াছেন। তাঁহার নিশানা ছিল অব্যর্থ। ব্যাঘ্রও শিকার করিয়াছেন। তিনি ছিলেন

ন্যায়নিষ্ঠ, যোগ্য শাসনকর্ত্রী। প্রজারা তাঁহাকে ভালবাসিত। আকবর সেনাপতি আসফ খানকে তাঁহার রাজ্য অধীন করিবার জন্য পাঠাইলেন। আসফ খান জয়ী হইলেন। দুর্গাবতীকে বিতাড়িত করা হইল, সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। শেষযুদ্ধে দুইটি তীর তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করিলেন। প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল। বেশীর ভাগই আসফ খান নিজের জন্য রাখিয়া দিলেন। আকবরের "সদুক্তির" মধ্যে একটি উল্লিখিত আছে যে, "একজন সম্রাটকে সর্বদাই যুদ্ধজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, নতুবা শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে।" যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষসমর্থকরা সহজেই এই যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন। আকবরের উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রে যদিও ছিল সাম্রাজ্য-বিস্তার, তাঁহার পক্ষে এইসব ছল অপেক্ষা মূল্যবান সমর্থন ছিল। যদি তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রায় বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিরন্তর আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইত—তাঁহাকে সর্বদাই হয় এদিকে নয় ওদিকে বিদ্রোহ লইয়া চিন্তিত থাকিতে হইত; সিংহাসনের জন্য সর্বদাই কোন না কোন দাবীদার ছিল। ১৫৮১ পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষিপ্র কর্মদক্ষতার ফলে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্য ধীরে ধীরে বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন। "আহার করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়াইয়াছিলেন" অথবা প্রথম হইতেই সুদূর-প্রসারী বিরাট পরিকল্পনার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার করতলগত করিতে চাইয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তবে ফলত তাহা একই।

রাজপুতদের ঘাঁটি চিতোর আকবরের চিন্তায় কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। তিনি সমগ্র উত্তর ভারত অধিকারে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজনকে ছাড়িয়া দিলে রাজপুত প্রধানেরা তাঁহাদের পার্বত্য বাসভূমি ও সুরক্ষিত দুর্গ হইতে অহঙ্কারে উদাসীন ছিলেন কিংবা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৬৭ তে আকবর আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে চিতোর অবরোধ করিলেন। চিতোর—সমতল ভূমি হইতে হঠাৎ আট মাইলের মত পরিধির বিরাট পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে। সেই উচ্চতায় শহর, তাহার চারিদিক সুরক্ষিত, শহরে প্রচুর সুন্দর সৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভ, এত উপরেও অফুরন্ত জলের সরবরাহ। মেবারের রাজপুতগণ তাঁহাদের শৌর্য ও বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু তখন অদৃষ্ট তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন। যখন তাঁহাদের স্বাধীনতা বিপন্ন, সেই দুর্দিনের শাসক রাণা উদয়সিংহ শুধু যে আকবর পরিচালিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুপযুক্ত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি ছিলেন রাজপুত নামের অযোগ্য, কাপুরুষ। আকবরের আগমন বার্তা পাইয়াই তিনি চিতোর হইতে পলাইয়া বহুদূরে আত্মগোপন করিলেন। জয়মল রাঠোর নামে এক প্রধান ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। সতর্কভাবে এবং অতি কুশলতায় আকবর পার্বত্যদুর্গগুলিকে আক্রমণ করিলেন। বলদের সারি পাহাড়ের খাড়া পথ দিয়া কষ্টে ভারী ভারী সাঁজোয়া টানিয়া তুলিল। আকবর কয়েকবার প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। ডিসেম্বরে দুইটি 'মাইন' বিস্ফোরণ করা হইল কিন্তু কোনটিই ঠিক সময়ে করা হয় নাই বলিয়া কিছুই হইল না। প্রথম

দলের মাইনটি ফাটাইবার ফলে যে খাদ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছুটিয়া যাইতে না যাইতেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণে তাহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া গেল। খাদ আবার ঠিকঠাক করিয়া দুর্গ ঘিরিয়া রাখিয়া একটি আচ্ছাদিত পথ দিয়া আকবর অগ্রসব হইলেন, তাঁহার সৈন্যদলের অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে একটি পথ নির্মাণও সমাপ্ত হইল।

তেইশে ফেব্রুয়ারী আকবর পত্রাচ্ছাদিত পথের ফাঁক দিয়া দেখিলেন দুর্গের পরিখার ধারে দাঁড়াইয়া একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজপুতদের আদেশ নির্দেশ দিতেছেন। আকবর তাঁহার বন্দুক লইয়া ভাল করিয়া নিশানা করিয়া গুলি ছাড়িতেই সেই ব্যক্তি ভূপতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই আক্রমণকারীরা দেখিল শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আগুনের শিখা দেখা যাইতেছে। ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পাবিয়া তাহারা পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিল। ভগবানদাস নামে একজন রাজপুত রাজকুমার আকবরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে যুক্ত ছিলেন এবং মুঘল সৈন্যদলে কাজ করিতে-ছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন—ইহা সেই ভয়ঙ্কর ব্রত জহর। কোন রাজা রণক্ষেত্রে নিহত হইলে, তাঁহার অন্তপুরের সম্মান রক্ষার জন্য নারীগণ আগুনে পুড়িয়া মরে। আকবর বুঝিলেন যে তাহা হইলে তাঁহার গুলিতে দুর্গের অধিপতি জয়মল রাঠোর মারা গিয়াছেন। সব অবসান হইল—কারণ ভারতবর্ষে সেনাপতির মৃত্যুর অর্থ হইল তাহার সেনাদের পরাজয়। বৃথাই রাজপুত সৈন্যগণ চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইলেন, বৃথাই তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা ও যুবতীরা যুদ্ধ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে আকবর হস্তীপৃষ্ঠে সম্পূর্ণ পরাজিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তিনি

আবার প্রাণপণ প্রতিরোধ পাইলেন। শোনাযায় নগরীর সম্পূর্ণ পতনের আগে আট সহস্র রাজপুত তাঁহাদের জাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দেন। আকবর এই প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সাধারণ বিজিতদের প্রতি তিনি যে উদারতা দেখাইতেন তাহা একেবারেই দেখাইলেন না। তাঁহার আদেশে শহরের হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হইল।

ইতিপূর্বে আর কোন অভিযানকারী গর্বিত রাজপুতদের এইভাবে অবনত করিতে সমর্থ হয় নাই। চিতোরের প্রসিদ্ধ ও পবিত্র দুর্গের পতন ও তাহার পরবর্তী হত্যাকাণ্ড রাজপুতজাতি কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই বীরত্বময় প্রতিরোধ মুঘল সৈন্যদের মনেও গভীর ছাপ ফেলিয়াছিল। আকবর জয়মল ও তরুণ রাজপুত্র পাট্টার দুইটি মূর্তি দিল্লীতে স্থাপন করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পাট্টা, তাঁহার জননী ও জায়া সকলেই চিতোরের জন্য যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন।

সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও একটি বস্তুর অভাব আকবরের ছিল। একটি জিনিষেরই জন্যই ছিল আশা। বিধাতা এখনও পর্যন্ত তাঁহাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাঁহার বহু পত্নী ছিল কিন্তু একটিও পুত্র নাই। একবার যমজসন্তান হইয়াছিল কিন্তু তাহারা শৈশবেই মারা গিয়াছিল। তিনি বহু পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, বহু প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু যে মানুষ নিজের কর্মের উত্তরাধিকারীর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল তাঁহার জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ তাহা হইতে তিনি এখনও বঞ্চিত। শেখ সেলিম নামে এক সাধু আগ্রা হইতে মাইল কুড়ি দূরে সিক্রি নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে একটি কুটিরে থাকিতেন। তিনি সম্রাটকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, তিনি তিনটি সন্তান লাভ করিবেন। যেদিন আকবর সহর্ষে শুনিলেন যে জয়পুররাজকুমারী, তাঁহার মহিষী সন্তানসম্ভবা সেদিন সেই দিব্য ভবিষ্যদ্‌বক্তা সাধুর বাসস্থল সিক্রিতে তাঁহাকে সন্তান প্রসবের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ১৫৬৯ অগাস্টের শেষ দিকে একটি পুত্র হইল। সাধুর নাম অনুসারে তাঁহার নাম রাখা হইল সেলিম। পর বৎসর জুনমাসে তাঁহার উপপত্নীর গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান মুরাদের জন্ম হয়। আকবর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—তখন যদি পুত্রদের পরবর্তী জীবনের ছবি তিনি দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিত।

এইস্থানে তাঁহার পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া স্থানটিকে তাঁহার পবিত্র মনে হইল। পুত্র জন্মের উপলক্ষে এইস্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। নির্মাণ কার্য দ্রুত আরম্ভ

হইল এবং প্রায় চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া নগরী নির্মাণ কার্য চলিল। মসজিদ হইল, রাজপ্রাসাদ উঠিল, বিদ্যালয়, স্নানাগার ও উদ্যান নির্মিত হইল, পোলো খেলিবার এবং হস্তীযুদ্ধের জন্য প্রাঙ্গণ তৈয়ারী হইল, নগরী বেষ্টন করিয়া লাল পাথরের প্রাচীর রচিত হইল, শহরের জলের ব্যবস্থার জন্য ছয় মাইল দীর্ঘ কৃত্রিম হ্রদ খনন করা হইল। গুজরাট বিজয়ের পর নগরীর নাম দেওয়া হইল ফতেপুর সিক্রি—বিজয় নগরী। মসজিদের সম্মুখ দ্বারের উপর বিখ্যাত উক্তি খোদাই করা হইল: যীশু বলিতেছেন—এই পৃথিবী এক সেতু, ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হও, এখানে অট্টালিকা নির্মাণ করিও না।

আকবরের অমানুষিক শক্তির সহিত তাল রাখিয়া প্রাচীর ও মিনারগুলি যেন দ্রুত নির্মিত হইতে পারিতেছিল না। সমরকন্দের তৈমুরের মত তিনিও সমস্ত কারিগর ও মিস্ত্রিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্দেশ দিতেন। কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই প্রাসাদ নির্মাণ তাঁহাকে এক তীব্র আবেগের মত পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি যখন লাল পাথরের খণ্ডগুলিকে দেখিতেন, তখন মনে মনে তাহাদের মধ্য হইতে কী আকৃতির স্তম্ভ, খিলান বা প্রাচীর হইবে তাহা দেখিতে পাইতেন। কোন কোন সময় অন্য কারিগরদের সহিত তিনিও নিজে পাথর আনিতে না পারিলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেন না। প্রাসাদগুলি তাই অভাবনীয় দ্রুতগতিতে নির্মিত হইতে লাগিল। আকবর যেন সর্বদাই শুনিতে পাইতেন, "কালের রথ দ্রুতবেগে পক্ষবিস্তার করিয়া আসিতেছে", যেন কোন এক ভবিষ্যৎ-অনুভূতি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য ধ্বংস হইবে, সেই সময় আসিতেছে যখন

মসজিদের উপরে লিখিত বাণী যেন অদৃষ্টের ঘোষণার মত শোনাইবে, তাঁহাব সৃষ্টির জন্য সকল পরিশ্রম স্বপ্নজালের মত মনে হইবে। নগরীটি ক্রমে এশিয়াসংস্কৃতির একটি প্রধান্ কেন্দ্র ও সমকালীন জগতের অন্যতম ঐশ্বর্যময় নগরী হইয়া উঠিয়াছিল। নগরীটি যেমন সহসা পরিকল্পিত ও নির্মিত হইয়াছিল, তেমনই সহসা একদিন তাহার রচয়িতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। নগরীর স্বাস্থ্য কি খারাপ ছিল? জল সরবরাহের সুব্যবস্থা হয় নাই? হয়ত তাহাই, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী সম্ভব হইল কোন কাবণে, অথবা কারণ না বলাই ভাল, কোন কুসংস্কার বা তাঁহার অন্তরের কোন দুর্জ্ঞেয় প্রেরণায় আকবর ইহা হঠাৎ পরিত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষে প্রথম যে সকল ইংরেজ ভ্রমণকারী আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন এই শহরের বর্ণনায় বলিয়াছেন, "ইহা লণ্ডন অপেক্ষা অনেক বড়, অত্যন্ত জনবহুল, পারস্য এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহু বণিকেরা আসিয়া থাকেন, ইহা রেশম, কাপড়, মূল্যবান পাথর, হীরা মুক্তা চুনীর ব্যবসায় স্থল।" কিন্তু রালফ্ ফিচ্ ফতেপুর সিক্রিতে আসিয়াছিলেন, তখন আকবর এই নগরী পরিত্যাগের মুখে। ১৫৬৯ হইতে ১৫৮৫ পর্যন্ত এখানে রাজধানী ছিল। ১৫৮৫-র পর; একবার মাত্র অল্পকালের জন্য আসিয়াছিলেন। ১৬০৪ এ তৃতীয় জেসুইট মিশনের ফাদার জেরোম জেভিয়ার যখন এই নগরীর উপর দিয়া যান তখন সম্রাট নির্মিত বড় বড় অট্টালিকাগুলি ছাড়া শহরটি "সম্পূর্ণ ধ্বংস" হইয়া গিয়াছে। বিপুল জনশ্রী নগর পরিত্যাগ করিয়াছে। পথগুলি শূন্য। বিজয় নগরী আজ পরিত্যক্ত নগরী। শৃগাল ও বাদুড়দের আবাসস্থল। জেভিয়ার লিখিয়াছেন, "বলিতে ইচ্ছা হয়, এইখানে একদা ট্রয় নগরী ছিল।"

ইহার ঐশ্বর্যের প্রথমদিনগুলিতে ফতেপুর সিক্রিতে কত ভবন-শিল্পী, কত চিত্রকর, কত লিপিকার, কত কবি, সুরকার, কত দার্শনিক আসিতেন। ইহা বেসুনকার (Baisunqur)-এর সমকালীন হেরাটের ঐশ্বর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। রেনেশাঁশের পূর্ণতার দিনগুলিতে ইটালির উন্মাদনাময় চিন্তা ও সৃজনীশক্তি উদ্ভাসিত নগরীগুলির প্রকৃতি যদি না পৃথক হইত, তবে তাহাদের সহিত তুলনা করা চলিত। অভাবনীয় অর্থব্যয়ে নির্মিত নগরীটি, একটি মানুষের অদম্য ইচ্ছার সহসা মূর্তিমান রূপ। এই অপূর্ব অজস্র কলাকর্মে সজ্জিত নগরীর মধ্যে একটি কৃত্রিমতার উপাদান ছিল। অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল পরিবর্তিত হইয়াছিল প্রাসাদে, উজ্জ্বল জলরাশি বেষ্টিত-উদ্যানে; উদ্যানে ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছিল, পথের ধারে গাছ রোপন করা হইয়াছিল; সেইরূপ বহুস্থান হইতে বহু শিল্পী আনিয়া রাজবাড়িতে ও কারখানায় বসবাস করানো হইয়াছিল। তাহারা শিল্পচর্চা করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এখানে কোন স্থানীয় ঐতিহ্য ছিল না। মাটি হইতে ধীরে ধীরে কোন বিশেষ ধারা বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

আকবরের যে এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন বোধের অভাব ছিল তাহা নয়; আবার তিনি যে নিতান্তই আত্মগৌরবের জন্য উৎসুক ছিলেন তাহাও নয়। তিনি যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশান্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও তাঁহারা শিল্প ও সাহিত্যের স্বাদ কখনও ভোলেন নাই। বাবরের মধ্যে যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি অসাধারণ অনুভূতি দেখা যায় তাহা আকবরের ছিল না, কিন্তু তাঁহার শিল্পবোধের সঙ্গে একপ্রকার

ধর্মীয় অনুভূতি আংশিক মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন যথার্থই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, সংগ্রাহক এবং রসজ্ঞ। কিন্তু আকবরের কাছে শিল্প হইল সৃষ্টিজগতেব গৌরবের একটি পথ; এবং সেই জগৎস্রষ্টাকে অনুভব করিবার উপায়। তিনি স্বয়ং হুমায়ুন-কর্তৃক পারস্য হইতে আনীত শিল্পীদেব কাছে কাবুলে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই দুই পারসিক শিল্পী তাঁহার শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন। ধীবে ধীরে হিন্দু শিল্পী রাজসভায় আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সংখ্যা পারসিকদের ছাড়াইয়া গেল। ভারতীয় রীতি ও পারসিক রীতি মিলিয়া এক নূতন শিল্পধারার সৃষ্টি হইল। এই শিল্পধাবাব বৈশিষ্ট্য হইল—ব্যক্তিমূর্তি, 'ইলাসট্রেশান', জীবন্ত জনতাব দৃশ্য এবং নাটকীয় মনোভঙ্গির রূপায়ণ। লক্ষ্য করিলে দেখিব, যে এই চিত্রকরগণ ধাবমান শক্তির চিত্ররচনার কী ভক্ত! যেন আকবর তাঁহার অবাধ শক্তি এই শিল্পীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

এগুলি কোন মহৎ শিল্প নয়। সে সময় কোন মহৎ ক্ষমতা-সম্পন্ন শিল্পী ছিলেন না, সে ক্ষেত্রে এই চিত্রকরগণ যে কোন বীরত্ব-ব্যঞ্জক বা মহৎ আদর্শ রচনার দিকে না ঝুঁকিয়া সমকালীন জীবনের প্রত্যক্ষ বর্ণনার দিকে আকর্ষণবোধ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত ভাল বলিব। ইউরোপে নিখুঁত ছবি আঁকিবার ক্ষমতাশীল কত চিত্রকর উচ্চাভিলাষে ভ্রান্ত পথে গিয়াছেন বলিয়া আমরা নিন্দা করি। আর কিছু না হউক এই শিল্পীদের জন্যই আমরা দেখিতে পাই আকবর কীভাবে জীবনধারণ করিতেন, যুদ্ধ করিতেন, মৃগয়ায় যাইতেন, প্রার্থনা করিতেন, আর তাঁহার চারিদিকের পরিবেশটি কেমন ছিল।

তবুও বলা চলে না যে চিত্রকলাই আকবরের প্রধান আসক্তি বা অবসর বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল। এই সমস্ত চিত্র তাঁহার রাজধানীর বিচিত্রমুখী কর্মধারার একটি কর্মধারা মাত্র। চারিদিকে কর্মীদের ব্যস্ততা, সৈনিকদের গমনাগমন, রাজনীতিবিদ, দুঃসাহসীবীর, সরকারী কর্মচারীদের সমাবেশ—তাহাদের মধ্যে শিল্পীগণ। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাদের সমাদরও ছিল, কিন্তু তাঁহারা যে রাজ্যের গৌরব একথা বোধ করি তাঁহাদের পক্ষে মনে করা কষ্টকর ছিল। চারিদিকে কর্মব্যস্ত সংসার, তাহার কেন্দ্রস্থলে ফতেপুর সিক্রি—সেখানে শিল্পীদের মূল্য কতটুকু! এই রাজধানীর পরিবেশের সহিত লরেঞ্জোর সমকালীন ফ্লোরেন্সের তুলনা করিব না, ইহা ইম্পিরিয়াল রোমের সহিত তুলনীয়। যে আলোয় বহু আকাঙ্ক্ষা, বহু সম্ভাবনা মিশিয়া থাকে—ইহা যেন সেই প্রভাতের আলো নহে। সূর্য যেন মধ্যাহ্নের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আকবরের চিত্রকরেরা কোন পূর্ববর্তী শিল্পীর জীবনদ্বন্দ্বের মধ্যে প্রেরণা সন্ধান করেন নাই। তাঁহারা সিদ্ধ শিল্পগুরুগণের দিকেই চাহিয়াছেন। পারসিক শিল্পগুরুগণই তাঁহাদের আদর্শ। আকবর এই শিল্পীগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতার ফল সামান্যই ফলিত যদি না ইহার ফলে বহু অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের লৌকিক ধারাগুলির আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিবার আদর্শ ও সুযোগ ইহার মধ্য হইতেই মিলিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে মুঘল শিল্পরীতির মধ্যে হিন্দু উপাদান ক্রমশই বেশী প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজধানীর বাহিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উৎসাহে চিত্রকর লৌকিক চিত্রধারাকে সজীব করিয়া তুলিলেন। সমগ্র মুঘল শিল্পীরীতি আকবরের

রাজনৈতিক ভাবনারই প্রতিফলন : পারসিক, মুসলমানী ও হিন্দু-রীতির সংমিশ্রণ।

চিত্রকরগণের আদর্শ ছিল পারসিক রীতি। তাই এই সময় মুঘল চিত্রকরগণ প্রধানত পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লিপিশিল্প এখানে চিত্রশিল্প অপেক্ষা বেশী মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইত। আকবর উৎকৃষ্ট লিপিশিল্পীদের সমাদর করিতেন, নিজে যদিও লিখিতে পারিতেন না, তবু লেখার ভালমন্দ বুঝিতেন। চিত্রশিল্পী ও লিপিশিল্পীদের অধীনে একদল বাঁধাইকার ও খোদাইকার কাজ করিত। আকবরের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তাঁহার পাঠাগারে ২৪,০০০ গ্রন্থ আছে—সবই পাণ্ডুলিপি। অনেকগুলিই অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। এই কর্মীদের কাজ সপ্তাহে সপ্তাহে পরিদর্শন করা হইত, সম্রাট তাঁহাদের পুরস্কার দিতেন, বেতন নির্ধারণ করিতেন। চিত্রশিল্পীদের শুধুই ছোট ছোট মুখ-চিত্র অঙ্কন এবং পুস্তকের অলঙ্করণ কর্মেই নিযুক্ত করা হইত না, রাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত অট্টালিকাগুলিব দেয়ালগুলিতেও তাঁহারা ছবি আঁকিতেন। দুর্ভাগ্যবশত, সে-সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অট্টালিকাগুলি এখনও আছে। আকবরের বিরাটত্বের অপূর্ব স্মৃতিসৌধ। ফতেপুর সিক্রির পরিকল্পনা স্বয়ং আকবরের।

আকবর তাঁহার প্রাসাদ-সংলগ্ন কারখানাগুলিতে প্রায়ই যাইতেন। এখানে চিত্রকর, স্বর্ণকার, চন্দ্রাতপ-রচয়িতা, জাজিম-রচয়িতা, অস্ত্রনির্মাতাগণ কাজ করিতেন। আকবর আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের কাজকর্ম দেখিতেন। সেখান হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া তিনি পণ্ডিত, ধর্মবিদ্ এবং কবিদের সঙ্গে সময় কাটাইতেন। তাঁহার সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসের সঙ্গে অবশ্য তিনি

পরিচিত ছিলেন না। তুলসীদাস হিন্দীতে মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কাশীতেই তাঁহার জন্ম। কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু। আকবর যে তাঁহাকে জানিতেন না তাহাকে কোন সচেতন অবহেলা বলা চলে না।

বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এইবার তাঁহার দৃষ্টি হইল পশ্চিমমুখী। তাঁহার সাম্রাজ্যসীমান্ত ও আরবসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গুজরাট প্রদেশ। প্রদেশটি লোভনীয় বটে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে প্রদেশটি সমৃদ্ধ; আর এখন সেখানে কোন স্থির শাসন নাই, দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। মুজফ্ফর শাহ নামে মাত্র রাজা, অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদার বা সামন্ত সেখানে আছেন, তাঁহাদের একজন আবার তাঁহাকে অস্বীকারও করিয়াছেন, অন্যদের উপরেও বিশেষ অধিকার নাই। গুজরাট অভিযানের পক্ষে আরো একটি যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করা হইল যে এই প্রদেশ একদা হুমায়ুনের অধিকারে ছিল। ইহার রাজধানী আহমেদাবাদ অতি প্রাচুর্যপূর্ণ বিরাট নগর। কিছু পরবর্তীকালের এক ইংরাজ ভ্রমণকারী বলিয়াছেন 'ইহা লণ্ডনের মত বৃহৎ'—স্বর্ণজড়িত বস্ত্র, পারস্যের রেশমীঅংশুক এবং নানাপ্রকারের বস্ত্রব্যবসায়ীদের বিরাট সমাবেশ এই নগরে।

১৫৭২ এর জুলাই মাসে ফতেপুর সিক্রি হইতে আকবর দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। অভিযানের মুখে তাঁহার তৃতীয় সন্তান দানিয়ালের জন্মসংবাদ আনন্দবার্তা বহন করিয়া আনিল। যাত্রার প্রথম দিকে সবই স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। মুজফ্ফর শাহ্ একটি শস্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, ধরা পড়িতেই তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর ভাবিলেন তিনি গুজরাট জয় করিলেন। প্রদেশটিকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তাহার পর

তাঁহার স্বভাবানুযায়ী শাসনকার্যের সমস্ত সূক্ষ্মব্যাপারগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে আকবর কখনও সমুদ্র দেখেন নাই। একটু আশ্চর্যের বিষয় যে, আকবর যখন কাম্বেতে প্রথম সমুদ্র দেখিলেন, ভারত ও ইউরোপের সংযোগকারী এই জলরাশির উপর যাত্রা করিলেন তখন সমুদ্রযাত্রা তাঁহার মনে কী ছাপ ফেলিয়াছিল তাহার কোন বর্ণনা নাই। যে ইংরাজ ভ্রমণকারীর কথা আমি কিছু পূর্বে বলিয়াছি তিনি লিখিয়াছেন যে "কাম্বের বন্দরে তখন যে কোন সময়ে দুইশত সমুদ্রগামী-জাহাজ দেখা যাইত।" সম্রাটের কৌতূহল যে জাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নৌশক্তির সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে আসে নাই।

আকবর যখন কাম্বেতে তখন তাঁহার আত্মীয় ইব্রাহিম হুসেন মীর্জা সহসা বিদ্রোহ করেন। মাহীনদীর উপরে সরনাল নামক ক্ষুদ্র নগরটি তিনি প্রচুর সৈন্য লইয়া দখল করেন। ইহা শুনিবামাত্র আকবর ক্রোধে দ্রুতগতিতে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। যখন তিনি সরনালে উপনীত হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে মাত্র দুইশত অশ্ব। নদীর উপর দিয়া ছুটাইয়া, অন্যদিকের খাড়া পাড় বাহিয়া অশ্বগুলিকে লইয়া গেলেন। অন্যপারে শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তর সৈন্যদল অপেক্ষা করিতেছে। চারিদিকে বন্য তৃণলতার ঝোপ, তাহারই মধ্যে যোদ্ধাগণকে যুদ্ধ করিতে হইবে,—হাতাহাতি যুদ্ধ; ব্যক্তিগত শক্তিই এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিবে। আকবর ভগবান দাসের সহিত এক অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন, তিনজন শত্রুসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিল। দুইটিকে তিনি বিতাড়িত করিলেন, তৃতীয় সৈনিককে ভগবানদাস বর্শাবিদ্ধ করিলেন। ইতিমধ্যে

আকবরের অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল এবং রাত্রির অন্ধকার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু পলায়ন করিল। ইব্রাহিম পলাইল, পলাইয়া আশ্রয় সন্ধানে পাঞ্জাবে গেল এবং সেইখানেই আহত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল।

পরবৎসর গোড়ার দিকে আকবর সুবাট বন্দর অবরোধ করিলেন। ইহা তখন মীর্জাদের অধিকারে। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহারা পর্তুগীজদের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে। তিনি তখন পর্তুগীজদের সহিত যোগসূত্র স্থাপনেব ইচ্ছায় ভাইসরয়ের নিকট দূত পাঠাইলেন। ভাইসরয়-ও সম্রাটের নিকট অ্যাণ্টোনিও ক্যাব্রালকে পাঠাইলেন। সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৫৭৩ এর ফেব্রুয়ারীর শেষে সুরাট অধিকৃত হইল। এপ্রিল মাসে আকবর গৃহাভিমুখী হইলেন। তিনি জুনমাসে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কৌতূহল ছাড়াও অন্য কারণে পর্তুগীজদের সহিত সম্রাট সম্পর্ক রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই ইউরোপীয়দের ভাবতবর্ষ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল। যদিও মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, ইহা কোন স্থির অভিপ্রায়ে পরিণত হয় নাই। প্রথমে পর্তুগীজ এবং তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে তিনি আরো সংবাদ সংগ্রহ করিতে চাহিলেন। তাহাদেব উন্নততর গোলন্দাজবাহিনী তাঁহার ঈর্ষার বস্তু ছিল। আর একটি ব্যাপারে আকবর চিন্তিত ছিলেন। তিনি নিজে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। মক্কা-যাত্রীদের তখন আরবসাগর পার হইতে হইলে পর্তুগীজদের জাহাজে যাইতে হইত, অত্যন্ত আপত্তিকর অসৌজন্যতা ভোগ করিতে হইত। তাহাদের কুমারী মেরী ও যীশুর চিত্রসম্বলিত পাশপোর্ট সংগ্রহ

করিতে হইত আর পাশপোর্ট বড় সুলভ ছিল না। টম কর্‌ইয়াট নামক একজন অক্লান্ত অদম্য ভবঘুরে (তিনি মার্‌মেড ট্যাভার্ণ-এর সুধীসমাজের বিদ্রূপের পাত্র ছিলেন) লণ্ডন হইতে প্রায় সমস্তটা পথ পায়ে হাঁটিয়া আকবরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মুঘল দরবারে পৌঁছান। তিনি একটি গল্প বলিয়াছেন যে, একবার পর্তুগীজেরা একটি কুকুরের গলায় কোরান বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে ওরমুজ্‌-এর রাস্তায় ঘুরাইয়াছিল। আকবরের মা একটি গাধার গলায় বাইবেল বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে শহরে ঘুরাইয়া প্রতিহিংসা লইতে বলেন। কিন্তু আকবর সম্মত হন নাই। একটি নিষ্পাপ পুস্তকের উপর প্রতিহিংসা লওয়া তাঁহার শোভা পায় না। মন্দের দ্বারা মন্দ নিবারিত হয় না। এই কাহিনী সত্য হউক বা না হউক, ইহা নিশ্চিত যে এইসময়ে আকবর খ্রীষ্টধর্মে আগ্রহ বোধ করিতেন—যখনই তিনি পর্তুগীজদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসিতেন তাঁহাদের ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেন। শুধু যে ধর্মেই তাঁহার কৌতূহল ছিল তাহা নহে; পাশ্চাত্যদেশের মানুষদের আচার-ব্যবহার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি জানিতে চাহিতেন।

আকবর গুজরাট জয় করিয়া, বন্দীদের প্রতি অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া নূতন কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে অতি সহজে পরাজিত গুজরাট আবার বিদ্রোহী হইয়াছে। একমুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া আকবর আবার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই অভিযানে তিনি যেন এক আলেকজাণ্ডারের মত অদম্য দুঃসাহসে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রথম অভিযানে যদি

যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় অভিযানে তাঁহার স্বভাব-নায়কত্ব প্রকটিত হইয়াছে। গুজরাটের বিদ্রোহে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে, ভাগ্যের হাতে ফেলিয়া রাখিলে হইবে না। নিজে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পরিদর্শন করিলেন। কত খরচ হইবে তাহা এখন বুঝিতে পারা কঠিন বলিয়া ব্যক্তিগত কোষাগার হইতে অধিক অর্থ লইলেন।

তিন সহস্র অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া অগাস্টের প্রচণ্ড গরমে তিনি যাত্রা করিলেন। রাজপুতানার উপর দিয়া প্রতিদিন গড়ে পঞ্চাশ মাইল করিয়া যাইতে লাগিলেন। এগারো দিনে ছয়শত মাইল অতিক্রম করিয়া আহ্মেদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। মুহম্মদ হুসেন মীর্জার নায়কত্বে প্রায় বিশহাজার বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিতে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা ভাবিল, "সে কি? সম্রাট? আমাদের চরেরা যে খবর দিল তিনি মাত্র একপক্ষকাল আগে ফতেপুর সিক্রিতে। তিনি এখানে এতশীঘ্র আসিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব।" তাহাদের বিস্ময় শীঘ্রই বিফলতায় পরিণত হইল। আকবর যথারীতি ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করিলেন। শহরের সম্মুখস্থ নদী পার হইবার পর একটু বাধা আসিল। তবে ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনী উন্নততর সৈন্যদলের কাছে পরাজিত হইল। তাহাদের মনে হইল, আকবর "বাঘের মত" যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার অশ্ব আহত হইল। খবর রটিয়া গেল যে সম্রাট নিহত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি দ্রুতবেগে অন্য একটি অশ্বে আরোহন করিলেন, আবার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সৈন্যদল ক্ষণিকের হতাশা কাটাইয়া আবার দলবদ্ধ হইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। এই রকম মুহূর্তেই যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ণীত হইয়া যায়। শত্রুদল হারিতে লাগিল, মুহম্মদ হুসেন আহত অবস্থায় বন্দী হইল। যুদ্ধে আকবরের জয় হইল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ জয় হয় নাই। একঘণ্টার মধ্যে আর একজন বিদ্রোহী নেতা পাঁচহাজার সৈন্য লইয়া নগরীর অন্যদিক হইতে আক্রমণের প্রবল চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের পূর্বদলের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত অপসরণের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মধ্যে এক ভয়ার্ত অবস্থার সৃষ্টি হইল। বিজয়ী আকবরের ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর ভয়ে তাহারা এত হতবুদ্ধি হইয়া গেল যে পলাইতেও পারিল না। তাহারা এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের শত্রুরা তাহাদের তূণীর হইতে তীর এবং তাহাদের অস্ত্র লইয়াই তাহাদের আক্রমণ করিল। এইবার জয় সম্পূর্ণ হইল। তৈমুরের প্রাচীন এবং ভয়াবহ প্রথানুসারে (আকবর তাহা এখনও পালন করিতেন) দুই সহস্র ছিন্নমুণ্ডের এক স্তূপ রচনা করা হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে শাসক আকবর অপেক্ষা যোদ্ধা আকবর অনেকবেশী প্রথানুগত ছিলেন। পূর্বপুরুষের প্রথাগুলি যুদ্ধে পালন করা তাঁহার কাছে বিশেষ তাৎপর্যের ব্যাপার ছিল।

গুজরাটের আর তৃতীয়বার শিক্ষা দরকার হয় নাই। সে চিরকালের মত বিজিত হইল। তিনসপ্তাহে আকবর রাজধানীতে ফিরিলেন। সমগ্র অভিযানটিতে মোট তেতাল্লিশ দিন লাগিল।

বলা হইয়াছে যে, সামরিক উপকরণের দিক হইতে দেখিলে আকবরের সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত নিম্নস্তরের। কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ

ইউরোপীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধজয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই মত সত্য—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবু তিনি যে এই সৈন্যদলের নিপুণ ব্যবহার করিলেন তাহার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবে। তাঁহার উপকরণ যাহাই হউক না কেন, বিরাট সেনাপতির প্রয়োজনীয় গুণাবলীর প্রকাশ তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছে ; ক্ষিপ্রতা ও আকস্মিক আক্রমণে তিনি অসামান্য। এই ক্ষুদ্র ও আশ্চর্য অভিযানে তাঁহার এই গুণগুলি অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত।

১০

১৫৭৪-এর বসন্তকালে আকবরের রাজসভায় একজন যুবক আসিলেন। তিনি যেন উজ্জ্বল কর্মজীবনের জন্য বিধিনির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। কালে তিনি আকবরের ঘনিষ্ঠতম এবং বিশ্বস্ততম বন্ধু হইয়াছিলেন এবং আকববেব কীর্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

আবুলফজল শেখ মুবারকের সন্তান। তিনিও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও উদার মতবাদের জন্য সমভাবেই পরিচিত ছিলেন। ১৫৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের প্রথম একহাজার বৎসর পূর্ণ হইবে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় হইতে তাহা বিশেষ দূরেও নহে। মানুষের মনের উপরে সংখ্যাব এমনই যাদু যে একহাজার বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য লোকে উত্তেজনার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৌদ্ধরা এবং পরে খ্রীষ্টানেরাও তাহাদের ধর্মের একহাজাব বৎসর পূর্ণ হইবার সময় এমনই উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অনেকেই দৃঢ়-নিশ্চয় ছিলেন যে একটা কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটিবে। ঐসলামিক জগতে এই সময়ে আশা হইয়াছিল যে একজন 'মাধী' বা একজন পয়গম্বর আসিয়া ইসলামের বর্তমান অবস্থার সংস্কার করিয়া আবার তাহার সত্যরূপ প্রতিষ্ঠা করিবে। মুবারক এই ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলন আকবরকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং গোঁড়া ধর্মপণ্ডিতদের হৃদয়হীন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁহার মনকে আরো শক্ত করিতেছিল। মুবারক ধর্মীয় পণ্ডিতদের হাতে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উদারতা এবং ধর্মান্ধতার বিরোধী মনোভাব সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, আকবর গুজরাট বিজয়ের পর ফিরিয়া আসিলে

এই ব্যক্তিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে শুধু এই পৃথিবীর সম্রাট হইলেই চলিবে না, তাঁহাকে প্রজাদের আধ্যাত্মিক জীবনেরও সম্রাট হইতে হইবে। এই অতি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আকবর কখনও ভোলেন নাই। তাঁহার দুই সন্তানের মধ্যে আবুলফজলই কনিষ্ঠ। তাঁহারা দুইজনেই পিতার বক্তব্যের সহিত একমত ছিলেন। দুইজনেরই অল্পবয়সে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ফৈজী ছিলেন কবি, আবুলফজল পণ্ডিত। ১৫৬৭-তে চিতোর অবরোধের সময় ফৈজী প্রথম আকবরের নিকটে আসেন এবং সমাদরে গৃহীত হন। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে তিনি আকবরের সভাকবি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই আবুলফজলকে সম্রাটের নিকটে পরিচিত করেন। প্রথম হইতেই আকবর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে: তিনি তখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আশায় জ্বলিতেছেন, তবুও সম্রাটের মহিমার প্রতি পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইতেছেন। একদিন তিনি যখন মসজিদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন সেখানে আকবর প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে উল্লসিত ও চমৎকৃত করিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। আকবরের অনুগ্রহের এই আরম্ভ। আকবর আবুলফজলের মধ্যে তাঁহার মনের মত মানুষ পাইয়াছিলেন। তিনি যেন সভাসদ হইয়াই জন্মাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সজাগ ও নমনীয় বুদ্ধির লোক। জেসুইটগণ দক্ষ বিচারক —তাঁহাদের মতে সভাসদগণের মধ্যে আবুলফজলের গুণরাজি সর্বাপেক্ষা বেশী। লেখক হিসাবে তিনি অবশ্য নীরস। তাঁহার "আকবর নামা"-র অতি পল্লবিত পারসিক ভাষারীতির মধ্য হইতে

যথার্থ ঘটনা বাহির করা বড় কঠিন। কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক তথ্য আছে। আবুলফজল সৈন্য চালনা করিতে পারিতেন এবং আকবরের অনেক সেনাপতি অপেক্ষা বেশী সাফল্যের সঙ্গেই অভিযান পরিচালনা করিতে পারিতেন। এই সময় অবশ্য তিনি একজন উৎসাহী তরুণ ছাত্র, সম্রাটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সম্রাট তাঁহার ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমর্থন করিতেন এবং তাঁহাকে যথার্থ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময় আরো একজন আকবরের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনিও আবুলফজলের মত আকবরের ঐতিহাসিক হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। বাদায়ুনী মুসলমানদের মধ্যে একটি সংকীর্ণতম সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি গোপনে এবং ক্রমবর্ধমান ক্রোধের সঙ্গে সম্রাটের মুসলমান ধর্মাচরণের ত্রুটি লক্ষ্য করিতেন। প্রতি বৎসরেই সম্রাট সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কটু হইতে কটুতর হইতে লাগিল। কাজেই আকবরের জীবিতকালে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই সময় আকবরের মন ধর্মীয় আলোচনায় খুবই আকর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। আলোচনায় এই দুইজন যুবক অত্যন্ত গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণ হইতে যোগদান করিতেন। বাদায়ুনীর কাছে তর্ক ও অনুসন্ধানের মনোভাব আপত্তিকর ও প্রায় ধর্মবিরোধী মনে হইত, কিন্তু তাঁহার প্রভুর কার্যকলাপের জন্য গভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তখন আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে; আকবরকে দ্রুতগতিতে অভিযানের জন্য আয়োজন করিতে হইল।

এবার যুদ্ধ হইল বাংলা দেশে। তখন দায়ুদ নামক এক যুবক

রাজপুত্র বাংলার সিংহাসনে। বঙ্গ এবং বিহার দুটিই তখন আফগানদের হাতে। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং প্রচুর ধনরত্ন দেখিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং সীমান্তের একটি দুর্গ অধিকার করিলেন। আকবর তখন গুজরাটে। তিনি মুনীম খাঁ নামক এক বয়স্ক এবং তখন বয়োভারে ক্লান্ত সেনাপতিকে, দাউদকে শাস্তি দিবার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া পাটনায় তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। আর কিছু করিতে না পারিয়া আকবরকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। আকবর বঙ্গদেশে আগমন করিলেন।

এ এক নূতন ধরনের অভিযান। গঙ্গার উপর দিয়া সৈন্য লইয়া যাওয়া হইল। আকবর অবশ্য কিছু সৈন্য স্থলপথে পাঠাইলেন, কিন্তু বাকী সৈন্য চলিল বিরাট নৌবহরে, নদীর তীরে দাঁড়াইয়া গ্রামবাসীগণ অবাক চোখে দেখিতে লাগিল লাল পাল তুলিয়া অসংখ্য বড় বড় নৌকা গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, কোনটিতে হস্তী আছে, কতকগুলিতে আছে নানা উপকরণ, কোন নৌকায় বাগান, তাহাতে সুগন্ধি ফুল, পল্লব। এই আড়ম্বর ও বিলাস দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন ইহা আলস্যঘন বিলাসপূর্ণ অভিযান যাত্রা তিনি ভুল করিবেন। এই অভিযানে আকবর ফেড্রারিক বা নেপোলিয়নের মতই প্রথাসিদ্ধ সামরিক রীতিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুদ্ধরীতিতে বর্ষাকালে যুদ্ধযাত্রা না-করাই শ্রেয়। আকবর তাহা মানিলেন না। শত্রুপক্ষ যখন শুনিল যে রাজসৈন্যবাহিনী প্রবল বর্ষণ এবং বন্যাস্ফীত নদী

উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও অস্বস্তি দেখা দিল। আকবর যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাহাদের ভয় বাড়িতে লাগিল। তিনি পাটনা পৌঁছিলেন; শহর অধিকার করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য পাইলেন। দায়ুদ পলায়ন করিল। মুনীম, টোডরমল ও অন্যান্য সেনাপতিরা অভিযানের বাকী কাজ সমাপ্ত করিলেন। আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানী প্রত্যাবর্তন করিবার পথে তাঁহার মনে কতকগুলি পরিকল্পনার উদয় হইল এবং তাহা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। একটি "উপাসনা ভবন" প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেখানে ইসলাম ধর্মের সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ সমবেত হইয়া আলোচনা করিবেন। এই ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত তীব্র। এই আগ্রহের ফলে দ্রুত অট্টালিকা নির্মিত হইল, বহু বিতর্কের কণ্ঠস্বর তাহার প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম শুধুই নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বালোচনা হইত না, কে কোথায় বসিবেন তাহা লইয়াও বিরোধী পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক উঠিল। শেষে ঠিক হইল যে পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিৎ-গণ বসিবেন দক্ষিণে; সাধু ও মরমীয়াগণ বসিবেন উত্তরে, পশ্চিমে বসিবেন এই তর্কবিতর্কে উৎসাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং স্বয়ং আকবর। তিনি সভাপতি, কিন্তু তিনি রাজকীয় গাম্ভীর্যের সহিত সিংহাসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন না। অস্থির চিত্তে সহজভাবে তাঁহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; একবার একজনের সঙ্গে, আবার অন্য একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন।

ইসলামের অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব বিতর্কের প্রায়

শেষ হইত না। আকবর এখানে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত পাইতেন। মিল্টনের দেবদূতগণ যেমন তাঁহাদের অনন্ত অবকাশ আলোচনায় কাটাইতেন, আকবর তেমনই অবকাশ আলোচনায় কাটাইতে ভালবাসিতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এক অতৃপ্তির বোধ জাগিত লাগিল। তিনি ধর্মবিদ্‌গণের চাতুরীপূর্ণ পাণ্ডিত্য এবং জটিল তর্কবিতর্কে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, ক্লান্তি ক্রমশই বিরক্তিতে পরিণত হইল।

আকবর সমস্ত জিনিসই তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং আচরণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। আমার মনে হয় যে আকবর ধর্মমতগুলির গুণাগুণ তাহাদের নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের দিক হইতে বিচার না করিয়া, নিঃসন্দেহে, ধর্মমতাবলম্বীদের জীবনে যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহার দ্বারাই বিচার করিতেন।

আকবরের উপাসনাগৃহের উজ্জ্বল নবীন জীবনের বয়স যখন এক বৎসর হইয়াছে তখন রাজধানীতে একটি সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। সংবাদটিতে আকবর বড়ই চিন্তিত হইলেন। দুইজন খ্রীষ্টীয় মিশনারী বাংলাদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা যাহাদের ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন তাহারা রাজকর ফাঁকি দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া মিশনারীগণ তাঁহাদের পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধেও অসততার জন্য এমন ভাবে প্রতিবাদ করে এ কোন ধর্ম? আকবর তাঁহাদের প্রতি গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তিনি ইতিপূর্বেও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে সন্ধান লইয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ সংবাদ পান নাই। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে লোক পাঠাইয়া বাংলাদেশের প্রধান ধর্মযাজক ফাদার পেরেইবাকে আনাইয়া নানাবিধ প্রশ্নাদি

করিতে লাগিলেন। পেরেইরা যতখানি ধার্মিক ছিলেন ততখানি জ্ঞানী ছিলেন না। কাজেই সম্রাটের প্রশ্নের পর প্রশ্নের সম্মুখে বড়ই অসহায় বোধ করিলেন। তিনি তাঁহার চেয়ে কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য সম্রাটকে উপদেশ দিলেন। জেস্যুইটদের মধ্যে সেইরূপ ব্যক্তি ছিলেন গোয়াতে। সেখানে চিঠি পাঠানো হইল (চিঠিটি এখনও আছে)—ফতেপুব সিক্রিতে যেন তুইজন পণ্ডিত যাজক পাঠানো হয়। তাঁহারা অনেক দ্বিধার পর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রিডোল্‌ফো অ্যাকুয়াভিয়া নামক একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারেব তরুণ নেপল্‌স্‌বাসী জেস্যুইট গোয়ায় সত্ত আসিয়াছিলেন এবং মিশনেব প্রধানরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি এবং আন্তোনিও মনসারেট নামে এক স্পেনীয় (ইনিই পরে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন) রাজসভায় প্রেরিত হইলেন। হেনরিকুয়েজ নামে একজন ইসলাম হইতে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান পারসিকও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন।

আকবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে জেস্যুইটদের রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তিনি এক হীন কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি পর্তুগীজদের তাঁহার শত্রু মনে করিতেন, একদিন ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিবার আশাও পোষণ করিতেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই সকল ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহার রাজনৈতিক অভিসন্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। গোয়ার সহিত আচরণে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে মুখে এক ও কাজে অন্য করিবার দোষে অপরাধী। কিন্তু আমি কিছুতেই

বিশ্বাস করিতে পারি না যে খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আকবরের জানিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল অথবা জেস্যুইটগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল। এই আন্তরিকতার ফলেই শুধু যে তাঁহার সিংহাসন বিপন্ন হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার প্রাণও বিপন্ন হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই গৃহের বিপদ এবং চারিদিকের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহার পরিবর্তে তিনি কী রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ধর্মের জন্যই ধর্ম—এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁহার—এবং তাহারই জন্য তিনি অতৃপ্ত আসক্তি পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে যদি রাজনৈতিক লাভের সুযোগ থাকে তাহাকে অবহেলা করেন নাই।

আকবর তাঁহার প্রথম যৌবনে একবার যে রহস্যময় দৈবী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে আকবরের আবার সেইরূপ অনুভূতি হইল। ১৫৭৮-এর এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে অস্বাভাবিক-রকম বিরাট শিকারের জন্য অভাবনীয় আয়োজন চলিতেছিল। সময়ে সময়ে ইহার জন্য পঞ্চাশ হাজার বাজনদার নিযুক্ত করা হইত। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পরিধি লইয়া বৃত্তাকারে এই শিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দশদিন ধরিয়া বাজনাদারেরা এই দানবিক হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অকস্মাৎ, কোনরূপ পূর্বাভাস না দিয়াই সমস্ত নিরস্ত করিবার আদেশ আসিল। কেহ যেন "ক্ষুদ্র পক্ষীটিরও পালকে হাত না দেয়"—সকল পশুকে তাহাদের সুবিধা ও অভ্যাসানুযায়ী পলাইতে দেওয়া হয়।

কী ব্যাপার? গম্ভীরচিত্ত বাদায়ুনী লিখিতেছেন, "একটি

বিচিত্র অবস্থা এবং প্রবল উন্মাদনায় সম্রাট আচ্ছন্ন"। কেহ বলিতেছেন, ইহার জন্য হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন, উহার জন্য হইয়াছে, কিন্তু "শুধু আল্লাহ্-ই ইহার কারণ জানেন।" ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেবের উপস্থিতবুদ্ধি অতি প্রখর, তিনি লিখিয়াছেন, বোধ করি সম্রাট কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, কিংবা তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকিবেন।

আবুলফজলের বিবৃতি যদিও আলঙ্কারিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, তবুও আমার ধারণা তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। অনেক আগে বালকবয়সে তাঁহার যেমন অনুভূতি হইয়াছিল, তেমনই এই গ্রীষ্মের দিনে নির্জন-প্রান্তরে তিনি যখন অশ্বচালনা করিতেছিলেন তখন আবার সেইরূপ গভীর উন্মীলনের মুহূর্ত আসিয়াছিল। ঈশ্বরের সান্নিধ্য তিনি যেন অনুভব করিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার সমস্ত সাংসারিক বিপুল কর্তব্যের প্রতি, সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি, এমনকি তাঁহার সিংহাসনের প্রতিও এক প্রবল বিরাগ দেখা দিল। মনে হইল সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দীন সাধুদের মত নিজের মন লইয়া একাকী নির্জনে থাকা কত ভাল। এইরূপ নিবিড় চিন্তার মুহূর্তে নিরীহ পশুদের ব্যাপক ও ভয়াবহভাবে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুতিকে তাঁহার কাছে ভয়ঙ্কর ও নির্বোধ অপরাধ মনে হইল। ভগবানের চোখে সমস্ত জীবন এক। তিনি একটি গাছের তলায় বসিয়া এই চিন্তা করিতেছিলেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধের জীবনে যেমন ঘটিয়াছিল তেমনই আকবরের জীবনে এক উজ্জ্বলিত মুহূর্ত আসিয়াছিল।

কিন্তু আবার সেই বিহ্বলতা কাটিয়া গেল। রাষ্ট্রীয়কর্মের জরুরী দাবী, কর্মব্যস্ত জীবনের অভ্যাস, প্রাণোচ্ছল দেহের প্রয়োজন

আবার তাঁহার অসীমমুখী আত্মাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আকবর আবার সম্রাট, অক্লান্তকর্মী এবং প্রজারক্ষকে পরিণত হইলেন। অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে তিনি উপাসনা-মন্দিরে আসিতেন কিন্তু ইহা এখন অতি তিক্ত বিতর্কের বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গণের মধ্যে তিক্ত বিরোধ : প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে, সত্য শুধু তাহারাই জানে। কিন্তু একজন কী করিয়া বলিতে পারে যে তাহার কথাই সত্য ? আকবর সর্বদা তাহাই ভাবিতেন। এই মুসলমানগণের এত দৃঢ় প্রত্যয়, এত গোঁড়ামি তাঁহার কাছে অস্বাভাবিক মনে হইত ; তাঁহার যতই সন্দেহ জাগিত, তাহারা যেন ততই প্রত্যয়ী হইয়া উঠিতেন। তিনি যাহা সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করিতেন ইসলাম তাঁহার নিকটে তাহাই উদ্ঘাটিত করিতেছিল—এবং শেষে তাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

তিনি সত্য সন্ধান করিতে চাহিতেছেন—সত্য কোথায় পাওয়া যাইবে ? যদি অন্য ধর্মমতাবলম্বীদেরও বিতর্কে আহ্বান করা যায়—তাহা হইলে হয়ত কিছু সিদ্ধান্ত হইবে। কিছু জানা যাইবে। সকল ধর্মকে আমন্ত্রণ করা হইল। সুন্নী, শিয়া, সুফী প্রভৃতি ঐশ্লামিক সম্প্রদায় ছাড়াও এখন সেখানে আসিল হিন্দু, জৈন, পার্শী, জোরাষ্ট্রিয়ান, ইহুদী এবং তাহাদের সঙ্গে খ্রীষ্টানগণ।

১৫৮০-র ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকমাসের যাত্রাশেষে অ্যাকুয়াভিয়া ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবশেষে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজধানীর ঐশ্বর্য দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন শহরের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত, মুণ্ডিত গণ্ড-মস্তক, নিরস্ত্র বিদেশীদের দেখিবার জন্য প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া যাইত। সম্রাটের দৃষ্টিতেও তাঁহাদের প্রথম উপস্থিতিতে

অদ্ভুত লোক মনে হইয়াছিল। মুঘল সভাসদবৃন্দের মুক্তার মালা, রেশমী পরিচ্ছদ, ঐশ্বর্যের আবহাওয়া, তাহার মাঝখানে তাহাদের আচরণ সরল এবং বিলাস-ব্যসনের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তিহীন। আকবরের রাজসভার এক শিল্পী এই দৃশ্যটি অঙ্কন করিয়াছেন। অ্যাকুয়াভিয়ার দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ, তিনি একটু বেশবাসে অপরিচ্ছন্ন, ভুলো মন, সর্বদাই তাঁহাব টুপি বা চশমা খুঁজিয়া ফিরিতেন। এত লাজুক ছিলেন যে সম্রাটের প্রতি সম্ভাষণ করিবার সময় বা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় লজ্জায় লাল হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল বীরের। এই মহান সম্রাটকে ধর্মান্তরিত করিবার দৈবপ্রেরিত সুযোগে তিনি অপরিসীম আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোপনে তিনি শুধু একটি ইচ্ছাই মনে মনে পালন করিতেছিলেন: শহীদের গৌরব মুকুট। কবে তাহারা আমাকে নিহত করিবে? তাঁহার জন্য আকবর সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সম্মান দিতেছেন—কিন্তু তিনি ক্লান্ত। তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য নিঃশ্বাস ফেলিতেন।

আকবর জেসুইটদের সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রচুর অর্থোপহার দিবার জন্য কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। তাঁহারা অবশ্য কিছু লইতে অস্বীকার করিলেন, পরেও বারবার অস্বীকার করিয়াছেন। আকবরের নিকট ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি তাঁহাদের আত্মসংযমের প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা সম্রাটকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিবার পূর্বে পেরেইরা-র নিকট হইতে সম্রাটের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে মনোভাব কী তাহা জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা শুনিলেন যে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আকবরের নিবিড় শ্রদ্ধা এবং বাইবেল-এর বাণীতে তিনি আনন্দ পান। কিন্তু যখন তিনি

শুনিলেন যে একই ঈশ্বরের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি আছে ; ঈশ্বর এক কুমারীর গর্ভে এক সন্তান দিয়াছেন তখন "সম্রাটের সমস্ত বিচার নিষ্প্রভ এবং আচ্ছন্ন হইয়া গেল।" এক ব্যক্তির একের বেশী পত্নীর বিরোধিতাও তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, বিশেষ করিয়া যে সম্রাটের হারেমে তিনশত পত্নী তাঁহার পক্ষে যে ইহা বড়ই অসুবিধাজনক সন্দেহ কি! যাইহোক মহম্মদ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য খুব শ্রদ্ধার নয়। আর জেস্যুইটদের পক্ষে ইহা অন্তত একটি শুভ লক্ষণ।

কাজেই জেস্যুইটরা যে আকবরের আমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের পশ্চাতে কিছু আশা ছিল। তাঁহারা সম্রাটের জন্য বাইবেল উপহার আনিয়াছিলেন। এই বাইবেলটি চারিটি ভাষায় লিখিত এবং সাতখণ্ডে বাঁধানো। আকবর তাহা গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন। পরে তাঁহাদের ইসলামধর্মের পণ্ডিতগণের সহিত বিতর্ক করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল।

প্রথমে আলোচনা হইল কোরান লইয়া। কোরানের লাতিন অনুবাদের সহিত জেস্যুইটগণ পরিচিত ছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত পরিচয়ে আকবর যেমন বিস্মিত হইলেন, মুসলমানগণ তেমনই বিরক্ত হইলেন। মুসলমানগণ এই আলোচনার শেষে এক অগ্নি-পরীক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে কোরান লইয়া এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে একজনকে বাইবেল লইয়া আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। যে পুস্তকটি অগ্নির মধ্য দিয়া আসিবার পরও অক্ষত থাকিবে, সেইটিই সত্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। খ্রীষ্টানগণ বলিলেন যে তাঁহাদের ধর্মের প্রামাণ্যতার জন্য কোন অলৌকিক ব্যাপারের প্রয়োজন নাই।

অবশ্য পরে অ্যাকুয়াভিয়া ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আদেশ দিলে তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে সম্মত ছিলেন, যদিও কোন অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন বলিয়া আশা করেন না। আকবর তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি এখন অ্যাকুয়াভিয়াকে বলিলেন যে তাঁহাব এক গোপন উদ্দেশ্য ছিল। ঐ দলের মধ্যে এক মোল্লা ছিল—সে অত্যন্ত ধার্মিকতার বড়াই করিত। কিন্তু আসলে সে ছিল অত্যন্ত অধার্মিক এবং দুষ্টপ্রকৃতির। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল যে এই লোক অগ্নিকুণ্ডে উঠিবে এবং আগুনে পুড়িয়া মরিবে। তিনি কোন দৈবী প্রভাবের কথা ভাবেন নাই, অন্তত কোরানের স্বপক্ষে ত' নয়ই। অ্যাকুয়াভিয়া বলিলেন যে খ্রীষ্টান পুরোহিতগণকে শুধুই যে "অন্যের জীবন হনন করিতে নিষেধ করা হয় তাহা নহে, অন্য একজনের হত্যার জন্য সাহায্য করাও তাহাদের নিষিদ্ধ।" আকবর বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমাদের এই অগ্নি-পরীক্ষা করিতে চাই না। তোমরা শুধু বল যে তোমরা এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক।"

"আমরা তাহাও করিতে পারি না।"

"বেশ, তোমরা তাহা হইলে সম্মতি দাও। আমি ঘোষণা করিব যে তুমি আগুনের মধ্য দিয়া যাইবে। তুমি তখন চুপ করিয়া থাকিবে।"

"যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিব যে আমরা তাহা করিব না। যদি ঐ লোকটি দণ্ডণীয় হয়, তবে এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক কৌশলে শাস্তি না দিয়া সোজাসুজি শাস্তি দিলেই হয়।"

এই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন মনসারেট। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন যে জেস্যুইটগণই এই পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়াছিলেন এবং নীচমনা মোল্লাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন। বাদায়ুনী লিখিতেছেন যে অগ্নিকুণ্ড তৈয়ারী হইয়াছিল ('আকবর নামার' একটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ছবি আছে, তাহাতে দেখা যায় যে বিতর্ককারীগণের মধ্যে একটি অগ্নি জ্বলিতেছে) এবং একজন শেখ একজন খ্রীষ্টীয় পুরোহিতকে তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সাহস ছিল না। আমার মনে হয় মনসারেট-এর কথাই বিশ্বাসযোগ্য। বোঝা যাইতেছে যে এই পরীক্ষায় আকবরের কোন বিশ্বাস ছিল না। তবে তাঁহার অনেক কুসংস্কার ছিল (অন্য অনেক ঘটনায় তাহার প্রমাণ আছে) এবং সেই কারণে এইরূপ পরীক্ষায় তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে। একটি মোল্লার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এই অভিনব ও শিশুসুলভ পরিকল্পনা অ্যাকুয়াভিয়ার কাছে অত্যন্ত হীন মনে হইলেও, ইহার মধ্যে আকবরের নিষ্ঠুর-রসিকতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। মনে হয় এই চ্যালেঞ্জ আরো কয়েকবার করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুই হয় নাই।

আকবর অ্যাকুয়াভিয়ার চরিত্রের স্বচ্ছতা, সাধুতা, এবং স্পষ্ট-ভাষিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ক্রমশই গভীর হইয়াছিল। কিন্তু আকবরের সমস্যা ছিল অতি সূক্ষ্ম এবং জটিল। তাঁহার পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাস এত অনমনীয় এবং পরধর্ম অসহিষ্ণু যে তিনি ক্রমশই সেই ধর্ম হইতে দূরে সরিতেছিলেন। ইহাতে যেটুকু বিরোধিতা হইয়াছিল তাহা

অপেক্ষা আরো বড় প্রকাশ্য বিরোধিতা যে হয় নাই তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য। সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে শঙ্কা, অবিশ্বাস এবং তিক্ত অনুভূতি জাগিয়াছিল। সন্দেহ নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংস্র বিতর্কের ফলে তাহাদের বিরোধীশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া আকবরের সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভ ছিল হিন্দুরা, তিনি তাহাদের বিশ্বাসজনক এবং ক্ষমতাপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। কিন্তু আকবরের প্রধান নির্ভর ছিল তাঁহার আপন শক্তি।

পরে খ্রীষ্টধর্ম তাঁহার কাছে বিশেষ আবেদন করে নাই। মনে হয় যদি অ্যাকুয়াভিয়া ও মনসারেট ভিন্নচরিত্রের লোক হইতেন, সৎ ও আদর্শবাদী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আকবর বেশীদিন ধর্মান্তর লইয়া এই খেলা খেলিতে পারিতেন না। তাঁহাদেব ইচ্ছা ছিল তাঁহারা আকবরের সমস্ত দায়িত্ব লইবেন, ভাবিয়াছিলেন আকবর একদিন তাঁহার মন ও ইচ্ছাকে চালনার ভার তাঁহাদেরই হাতে সমর্পন করিবেন। তাহারা আকববের জীবনধারাকে প্রথমে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একটি ব্যতীত অন্যসকল পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইবে; তাঁহাদের কাছ হইতে গোপনে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আরো উপদেশ লইতে হইবে, অন্য কাজ ও ক্রীড়াদির সময় কমাইতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিবার কোন্ ইচ্ছাই আকবরের ছিল না। তিনি বলিলেন যে বাইবেল এবং খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তবে খ্রীষ্টীয় ত্রি-ঈশ্বর তত্ত্ব, কুমারীমাতা সম্বন্ধে বুঝিতে পারিতেছেন না। এবং যতদিন না তিনি এই বিষয়গুলি বুঝিতে পারেন ততদিন

তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন না। অ্যাকুয়াভিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মনের উন্মেষের জন্য প্রার্থনা করুন এবং বিশ্বাসের নিকটে বুদ্ধিকে অবনমিত করিতে হইবে।

প্রথম হইতেই আকবর খ্রীষ্টানদ্বয়কে মুসলমান ধর্ম-নায়কদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের মহম্মদের উগ্র সমালোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাস্তবিকই একটু স্পষ্টবাক্ ছিলেন। কিন্তু আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য "নারকীয় দানব" মহম্মদকে যাঁহারাই শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিল। অ্যাকুয়াভিয়া গোয়ার ধর্মীয় প্রধানকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমরা সত্য প্রচার করিতে পারিতেছি না। যদি আমরা বেশীদূর অগ্রসর হই, হয়ত সম্রাটের জীবন-সংশয় হইবে"।

অতএব অবস্থা অত্যন্ত জটিল। একদিকে অ্যাকুয়াভিয়া—এখনও তরুণ, জগৎ-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (তিনি যখন গোয়ায় উপস্থিত হন তখনও তিরিশের নীচে), দুর্বল স্বাস্থ্য, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, স্বভাবে সাধু। তাঁহার চোখে এক বিরাট দেশের বিরাট শক্তিশালী সম্রাটকে ধর্মান্তরিত করিবার উজ্জ্বল স্বপ্ন। এই দেশ বর্বরে পরিপূর্ণ, এখনও যীশুর বচন তাহারা শোনে নাই। যদিও তাঁহারা এখন রাজপ্রাসাদে আসিয়াছেন (ইস্টারের পর আকবরের আমন্ত্রণে তাঁহারা তাঁহাদের অতি কষ্টকর পান্থশালার বাসস্থান হইতে প্রাসাদে আসিয়াছিলেন), আকবর তাঁহাদের অত্যন্ত সৌজন্য ও সম্মানের সঙ্গে সম্বর্ধনা করিয়াছেন, তবুও যে হৃদয়টিকে তাঁহারা জয় করিতে চাহিতেছেন তাহার ও তাঁহাদের মধ্যে এখনও দুর্ভেদ্য যবনিকা ঝুলিতেছে।

অন্যদিকে আকবর। তিনি যেন একাই দশটি ব্যক্তির জীবনের কাজ করিতেছেন, এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা তিনি একাকী দেখিতেছেন, শারীরিক-মানসিক দুইপ্রকার অবিশ্রান্ত, বিপুল কাজে ব্যস্ত। এই সব পরিত্যাগ না করিয়া, তাঁহার সত্তার সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার না করিয়া তিনি কেমনভাবে যাঁহারা তাঁহার সর্বাঙ্গীণ আত্মনিবেদন এবং তাঁহার জীবনধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাহিতেছেন তাহাদের হাতে নিজেকে তুলিয়া দিবেন? আর অ্যাকুয়াভিয়া যিনি ধর্ম এবং শুধু ধর্মের জন্যই বাঁচিয়া আছেন, যিনি নির্জনতাপ্রিয়, যিনি ক্রমাগত উপবাস এবং আত্মনিগ্রহের দ্বারা কৃশ, যিনি কুমারীমাতার গৌরব গান গাহিয়া নিজের মনকে তৃপ্তি দেন, যিনি শহীদ হইবার জন্য বহুদিন ধরিয়া আশা করিতেছেন—সেই অ্যাকুয়াভিয়া আকবরকে কী করিয়া বুঝিবেন? মানুষ হিসাবে দুইজনে দুইজনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাঁহারা দুই জগতের অধিবাসী।

খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদের নিভৃতে ডাকিয়া আকবর যে কথাগুলি বলিলেন তাহাতেই তাঁহার মনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, তিনি যেমন হিন্দুদের মন্দির নির্মাণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, তেমনই তিনি ঘোষণা করিতেছেন যে খ্রীষ্টানেরা তাঁহার সাম্রাজ্যে আসিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারিবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তাহাদের গীর্জা নির্মাণ করিতে পারিবে। পুরোহিতগণ এই স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণায় অভিভূত হইয়া গেলেন। আকবর 'এত ভালবাসা এবং সৌজন্যের' সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে সেদিন অ্যাকুয়াভিয়া তাঁহার রাজকুমার-ছাত্রটির জন্য একটি উগ্র (ধর্মীয়) বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা শেষপর্যন্ত তাহার সম্মুখে পড়িতে নিরস্ত হইলেন। তাঁহার ধর্মীয় উদারতার ফলে এই সময় আকবর প্রাণ-সংশয়ের সম্ভাবনায় সত্যই বিচলিত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার আভাস দিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যদি তিনি নিহত হন, তাঁহার বংশ ধ্বংস হইবে এবং সাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়া যাইবে। সেইজন্য তাঁহাকে সাবধানে এবং ধীরে ধীরে কাজকর্ম করিতে হইবে।

জেসুইটগণও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করিতে হইবে, দ্রুতভাবে উদ্দেশ্যসাধন করিতে চাহিলে হইবে না। আকবর তাঁহাদের কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা, অথবা তাঁহার পক্ষে যদি ইহা অপেক্ষা বেশী দেওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে তবে তাহাকে হতাশাব্যঞ্জক এবং বিস্বাদজনক বলিয়া কেহ ভাবিতে পারেন না।—সন্দেহ নাই, মনে হইতে পারে যে

ইহা তাঁহার সম্মতির একটি চিহ্নমাত্র, ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরো পাওয়া যাইবে। কিন্তু জেস্যুইটগণের মনোভাব ছিল ভিন্ন—হয় সবই পাইব, নচেৎ কিছুই চাই না।' হয়, আকবর খ্রীষ্টান হইবেন, খ্রীষ্টীয়-সমাজের বিরাট এবং ব্যাপক জয়লাভ হইবে; নতুবা তাঁহারা রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া গোয়ায় ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহাদের সর্বদা হিন্দুদের সহিত তুলনা করা হইত। পৌত্তলিকদের সহিত এইভাবে একাসনে আসীন হওয়া তাঁহারা অপমানজনক মনে করিতেন। সম্রাটের এই প্রাথমিক স্বাধীনতা-দানের মধ্য দিয়া পরে বড় সুযোগ আসিতে পারিত; কিন্তু তাঁহাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে।

অথচ, আকবরের পক্ষে এইটুকু স্বাধীনতার বেশী আর কিছু দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি দেখিয়াছেন সৎ লোকেরা বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসী। তিনি ভাবিতেন সকলের মধ্যেই সত্য আছে। ধর্মীয় ব্যাপারে সহানুভূতিপূর্ণ সহনশীলতাই ছিল তাঁহার স্থির নীতি। তাঁহার পূর্বপুরুষের ধর্মবোধ হইতে তিনি যে সরিয়া আসিয়াছেন তাহা শুধু মুসলমানদের অসহিষ্ণুতার ফলে। এখন তিনি খ্রীষ্টানদের মধ্যে অসহিষ্ণুতার একই প্রকার তীব্রতা ও শক্তি দেখিলেন। যদিও তিনি কখনও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে মনে হয় অন্য সব কিছু অপেক্ষা সেই অসহিষ্ণু মনোভাবই তাঁহাকে প্রতিহত করিয়াছিল।

কিন্তু, গ্রহণ না হয় না করিলেন, তিনি বর্জনও করিলেন না। তিনি উৎসাহ দিলেন, সম্মতি দিলেন, কিন্তু যখন তিনি চরম মুহূর্তে উপনীত হইলেন, যখন আত্মসমর্পনের এবং প্রতিজ্ঞার সময় আসিল, তখন তিনি তাঁহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ চাহিলেন। অথচ

তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কত রাত্রির অর্ধেক পুরোহিতদের সহিত প্রশ্ন করিয়া, বিতর্ক করিয়া, উপদেশ চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। অ্যাকুয়াভিয়া একজন ফার্সীর শিক্ষক চাহিয়াছিলেন, শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কয়েকমাসের মধ্যে তিনি এত ভাল ফার্সী শিখিলেন যে তিনি বাইবেলের কিছু অংশ ফার্সীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন এবং মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের ভাষাতেই বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আশা চরমে উঠিল যখন আকবর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের শিক্ষার ভার জেস্যুইটদের হাতে দিলেন। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারেই খ্রীষ্টধর্মের সর্বাপেক্ষা বেশী ভরসা।

তাঁহারা আবুলফজলের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গ-তে আনন্দ পাইতেন, তাঁহাদের প্রবলভাবে সমর্থন করিতেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র আকবরের সহনশীলতা-নীতির প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁহাদের (প্রভাব) দৃঢ়তর হইবার পর সম্রাটের অনেক আচার ও রাজ্যের মধ্যে নানা ধর্মীয় আচার পালনের অনুমতি দিবার জন্য জেস্যুইটগণ সম্রাটকে স্পষ্টভাবে ভৎ´সনা করিতেও দ্বিধা করিতেন না। তাঁহারা দুই যোদ্ধার দ্বন্দ্বযুদ্ধ দৃশ্য দেখিতে অস্বীকার করেন ; একটি ‘সতী’র চিতারোহণ দেখিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহারা প্রবলভাবে প্রতিবাদ করেন ; এমনকি ইসলামের শিক্ষায় তাঁহার সন্তান খারাপ হইয়া যাইতেছে বলিয়া সম্রাটকে অভিযোগ করেন। আকবর ইহাতে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। সত্য সত্যই তিনি ইহার পর হইতে সতীদাহ দেখিতে অস্বীকার করেন। ব্রাহ্মণেরা ইহার জন্য তাঁহার প্রতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। আকবর জেস্যুইটদের

সঙ্গে ঘরোয়াভাবে, কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা না করিয়াই কথাবার্তা বলিতেন, অ্যাকুয়াভিয়ার কাঁধে হাত দিয়া পায়চারী করিতেন। তাঁহাদের রাজপ্রাসাদের সর্বত্রই প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল; সম্রাট তাঁহাদের বিপুল উপহার দিতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি তাঁহারা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে অবিভূত হইয়া পড়িতেন। অধিক কি বলিব, এই পুরোহিতদের প্রতি আকবরের প্রসন্নতা এত ছিল যে মুসলমানগণের শত্রুতা ক্রমশই স্পষ্ট হইতেছিল এবং আকবর প্রায় খ্রীষ্টান হইলেন এমন গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যেখানেই গুজব ছড়াইল, সেখানেই গোঁড়া ব্যক্তিগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দেখিলেন সম্রাটের এই নিন্দিত দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণার সম্ভাবনা। যদিও প্রকাশ্যভাবে সম্রাটের পত্নীগণ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের বিরোধিতাও কিছু কম ছিল না। তাঁহাদের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম এবং তাহার একপত্নীত্বের ঘৃণিত নীতি এক ভয়াবহ ধর্মবিশ্বাসরূপে মনে হইয়াছিল। সম্রাট একটি বিদেশী ধর্মমত গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার সমস্ত পত্নীদের এক নিমেষে ত্যাগ করিবেন—ইহা অভাবনীয়, বা ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহার চেয়েও ভয়াবহ হইবে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে গ্রহণ করা। বাস্তবিকই, আকবরের জীবন বড় ঈর্ষার নয়।

আকবর এবং খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে তাঁহার মনোভাব সম্পর্কে জেস্যুইট-গণের বর্ণনা এত বিশদ এবং আন্তরিক; এবং বর্ণনাগুলি এত উচ্চমেধাবী ও নিপুণ পর্যবেক্ষক-কর্তৃক লিখিত যে সেইগুলি পড়িলে আকবরের উপরে খ্রীষ্টধর্মের এবং জেস্যুইটদের প্রভাবের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী মনে হইতে পারে। তিনি যেমন খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনই জৈনধর্ম বা জরুথুষ্ট্রের প্রাচীন পারসিক মতে

কম আকৃষ্ট হন নাই। আর, হিন্দুধর্ম—তাহার বেশকিছু প্রথা আকবর পালন করিতেন। শুধু ইসলামধর্ম সম্বন্ধেই তিনি নিঃসংশয়ে ধীরে ধীরে বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আকবরকে অন্যান্য ধর্ম-বিষয়ে যাঁহারা উপদেশ দিয়াছিলেন যদি আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ বিশদ বিবরণ পাইতাম, তাহা হইলে দেখিতাম যে আকবর জেসুইটদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গেও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। অবশ্য জেসুইটদের ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁহাকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল তেমনটি আর কেহ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক ধর্ম বিষয়েই তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে প্রত্যেকেই তাঁহাকে সেই ধর্মে ধর্মান্তরিত হইবেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। আর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি শেষমুহূর্তে এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছেন।

এই ধর্মমতগুলির মধ্যে বোধহয় জরথুষ্ট্রের মতবাদ তাঁহার মনে বেশী ভাল লাগিয়াছিল। দস্তুর মেহেরজি রাণা নামে গুজরাতী পার্সী ধর্মতত্ত্ববিদ আকুয়াভিভার মতই তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন ১৫৭৩ এ সুরাট অবরোধের সময়। তাঁহাকে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং তিনিই আকবরকে জরথুষ্ট্রের ধর্মের রহস্যে দীক্ষা দেন। অন্তরকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন এক বিশ্বাস আকবর অশান্ত চিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন। বোঝা যায় যে তিনি সূক্ষ্মতত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন না, বরং ধর্মমতের সমস্ত আচারের সহিত যুক্ত হইয়া ভিতর হইতে তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। একই রকম সততার সহিত তিনি সব

ধর্মের বাহ্যিক উৎসব অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতীক ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেমন, জরথুস্ত্রের ধর্মের একটি অঙ্গ সূর্যপূজা, সম্রাট তাহা গ্রহণ করিলেন, প্রাসাদে একটি অনির্বাণ পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আবুলফজলের উপর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল। আকবর তাঁহার রাজত্বের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষ হইতে বিনম্র চিত্তে প্রকাশ্যে সূর্য প্রণাম করিতে থাকেন। যখন সন্ধ্যায় আলো জ্বালানো হইত, তখন সমস্ত রাজসভা আকবরের ভাষায় "সূর্যোদয়ের স্মরণে" উঠিয়া দাঁড়াইত। জেস্যুইটদের আগমনের এক মাস পরে ১৫৮০র মার্চ মাসে পার্সীদের এই আচার প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্কে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আকবরের সূর্যপূজা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিংবা ইহার বেশী গুরুত্বই দেন নাই। আকবরের মনে ছিল মরমীয়াবাদের প্রতি প্রবণতা, জটিল তত্ত্বের প্রতি বিরাগ এবং গোঁড়ামির প্রতি ঘৃণা। খুবই সম্ভব যে জরথুস্ত্র ধর্মের এই প্রতীকের সারল্য তাঁহার মনে গভীর আবেদন করিয়াছিল। তাঁহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে যখন তিনি জেস্যুইটদের সহিত খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তিনি জরথুস্ত্র অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিতেছিলেন এবং নিজেই তাহা অভ্যাস করিতেছিলেন।

আরো একটি ধর্ম তাঁহার জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহা জৈনধর্ম। এই ধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত প্রাচীন না হইলেও খুবই প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের মতই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ইহার জন্ম। ইহার প্রধান নিয়ম হইল কোনরূপ প্রাণীহত্যা—কী মানুষ, কী পশু—সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৫৭৮ হইতে দুই তিনজন

জৈন পণ্ডিত তাঁহার সভায় সর্বদা থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হীব বিজয়। ইনিও আকুয়াভিভার মত আকবরের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

শিখধর্মের সহিতও সম্রাটের কিছু সম্পর্ক ছিল। যদিও এই ধর্ম তাঁহাব উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তিনি শিখদের প্রতি সহানুভূতি ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন কবিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিতেন। আকবর তাঁহার স্বভাববশতঃ তাঁহাদেব উভয়ের সহিত আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। শিখগুরু অর্জুনসিংহ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছিলেন যে হিন্দুদেবতাগণের প্রতি এবং মুসলমান নবীদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু আকববেব ভাষায় অর্জুনসিংহের রচনা "শ্রদ্ধাবই যোগ্য"। তাঁহাব রচনায় আকবর দেখিয়াছিলেন অনাবিল ঈশ্ববভক্তি ও প্রেম।

১২

শাহ মন্‌সুর সাধারণ কেরানীমাত্র ছিলেন, তবে হিসাবপত্র ও আয়ব্যয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ প্রবণতা ছিল। আকবর তাঁহার যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। হিসাবের প্রতিভা, যথার্থতার প্রতি অনুরাগ এবং হৃদয়ের কাঠিন্য তাঁহাকে আদর্শ কর্মচারী করিয়াছিল। তাঁহার অর্থের প্রতি অনুরক্তি তাঁহার কর্মদক্ষতাকে আরো বাড়াইয়াছিল। সদ্যবিজিত বঙ্গবিহার সুবাগুলি কতকগুলি অপ্রিয় প্রশাসনিক নির্দেশের ফলে, বিশেষ করিয়া সরকারী কাজের জন্য অশ্ব বাছিয়া লইবার ব্যাপারে, একটু অধৈর্য প্রকাশ করিয়াছিল। নির্দেশগুলি যাহাতে দৃঢ়ভাবে পালিত হয় শাহ মন্‌সুর তাহাতে জোর দিলেন এবং নিজ দায়িত্বে তিনি কর্মচারীদের বেতন কমাইয়া দিলেন। ইহার ফলে এবং অন্য নানা অভিযোগের জন্য বাংলাদেশের মুসলমানগণ আকবরের নূতন ধর্মচিন্তায় এবং ইসলাম হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতায় আরো ভীত হইয়া পড়িলেন। অসন্তোষ ক্রমে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হইল। একজন ধর্মতত্ত্ববিদ্ বিধর্মী সম্রাটের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ঘোষণাও করিলেন। বিদ্রোহের নেতারা কাবুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কাবুলে তখন আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা। মহম্মদ হাকিম দুর্বল এবং পানাসক্ত। কিন্তু তাহাতে কী হইয়াছে? সে ধর্মে গোঁড়া—কাজেই তাহাকেই সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিল। ১৫৮০র গোড়ার দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৫৮১-তেও তাহা দমন করা সম্ভব হইল না। মহম্মদ

হাকিমের সহিত গোপনে যোগাযোগ চলিতে লাগিল। আশা ছিল যে, সে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে ; তাহা হইলে দুইদিক হইতে একই সময়ে রাজশক্তি আক্রান্ত হইবে এবং এক ধর্মবিশ্বাসী রাজপুত্রের সমর্থনে সমস্তদেশ জাগিয়া উঠিবে। রাজসভার প্রধান লোকেদেরও এই ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। শাহ মনসুর তাহাদের অন্যতম। আকবর কিছুদিনেব মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত হইলেন। মহম্মদ হাকিমের কাছে লিখিত শাহ মনসুবের চিঠিগুলি খুলিয়া পড়া হইল এবং তাঁহার পদ হইতে তাঁহাকে কিছুকালেব জন্য বহিষ্কৃত করা হইল। কিছুকাল পরে আকবর যখন ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত রক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন তখন তাহাকে পুনরায় সেই পদে ফিরাইয়া আনা হইল। সুযোগ বুঝিয়া শাহ মনসুর আবার বিশ্বাসঘাতকের মত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, চিঠিপত্রগুলি আবার সম্রাটের হাতে পড়িল। এইবার তাঁহাকে কারাগারে দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা পাঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। কিছু তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হইল। রাজসভায় গোপন বিরোধিতা চলিতে লাগিল। এইসব ব্যাপার আকবর একেবারে পরিষ্কার করিয়া লইতে চাহিলেন। অসাধারণ যত্নে সেইজন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার সিংহাসন ঘোর বিপদের সম্মুখীন। এই সময়ে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন।

আকুয়াভিভা ও মনসারেট বড়ই মানসিক উদ্বেলতার মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা মুসলমানদের মধ্যে যে প্রবল বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা জানিতেন। তাঁহাদের প্রতি এত দাক্ষিণ্যের

ফলেই যে সম্রাটের বিপদ হইয়াছে এবং তাহারা যে সেজন্য কিছু দায়ী তাহাও বুঝিতেন। তাই এইসব গোলমালের সূচনাতেই তাঁহারা আকবরের নিকট জানিতে চাহিলেন যে সম্রাট তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে চাহেন কিনা। আকবর তাহাদিগকে গৃহকাতর বলিয়া ভৎর্সনা করেন। যখন অভিযানের সিদ্ধান্ত লওয়া হইল, তাঁহারা অভিযানে যোগ দিতে চাহিলেন। আকবব বলিলেন, না, তাঁহারা শান্তির মানুষ, যুদ্ধের কঠিন জীবন অপেক্ষা ঈশ্বরচিন্তা তাঁহাদের উপযোগী। তাহারা সম্রাটের জননীর নিকটে থাকিবেন। কিন্তু পরদিন যখন মুরাদ তাঁহাব শিক্ষকের নিকট পাঠ লইতেছিলেন তখন সম্রাট উপস্থিত হইলেন এবং মনসারেট-কে প্রস্তুত হইতে বলিলেন: তুমি আমার সঙ্গে যাইতেছ।

এইভাবে একজন জেসুইট মুঘলসৈন্যের সহিত আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন। তিনি যে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিলেন তাহা বিস্ময়-কর। তিনি এক ক্রুদ্ধ মুসলমান জনতাব সম্মুখে মহম্মদের নিন্দা করিয়াছিলেন। আকবরের ভয়েই তাহারা সংযত হইয়াছিল, নহিলে খাইবার-এর সংকীর্ণ পথে পাথর দিয়া মারিয়া ফেলিত। সুখের বিষয় তিনি তাঁহার লেখাগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান দর্শকের চোখে আকবরের যুদ্ধ চালনার বর্ণনাগুলি আমরাও সৌভাগ্যবশতঃ পাইয়াছি। পারসিক ভাষায় লেখকগণ বহুজিনিস পাঠকের সুপরিচিত বলিয়া বাদ দিয়া গেছেন কিন্তু এখানে আমরা বহু খুঁটিনাটির পরিচয় পাই। পর্যবেক্ষক হিসাবেও মনসারেট বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সামরিক ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, সাধুও আপনভোলা আকুয়াভিভার মত শুধু ধর্মচিন্তায়ই বিভোর ছিলেন না। আমাদের এই ছোট আলোচনায়

আকবর যে সব যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ব্যতীত কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আমরা মনসাবেট-এর বর্ণনাব সাহায্যে এই যুদ্ধটি একটু বিশদ ভাবে বণনা করিতে পাবি।

যখন মহম্মদ হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ কবিতে সাহস করিলেন তখন আকবব কোন খেয়ালই কবিলেন না। মনে হয় "মশা সম্বন্ধে ঈগল পাখী" যতটুকু ভাবিতে পাবে, আকবব ততটুকুই ভাবিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি সৌজন্যপূর্ণ পত্র দিলেন। কিন্তু মহম্মদ হাকিম নিজেকে নিজের ভাই-এর হাতে তুলিয়া দিতে চাহিলেন না। বিশেষ করিয়া তাঁহার সন্দেহ ক্রমেই আশঙ্কায় পরিণত হইল যখন শুনিলেন যে আকবর মৃগয়ায় আদেশ দিয়াছেন। যে কোন অভিযানের পূর্বে ইহা আকবরেব প্রথম কাজ। যখনই তিনি কোন মৃগয়ার আদেশ দিতেন তখনই তাঁহার শত্রুদের হৃদয় আশঙ্কায় কম্পিত হইত। মহম্মদ হাকিম অবিলম্বে পলায়ন করিলেন, একেবারে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় পর্বতেব উপর দিয়া ছুটিলেন। নদী পার হইতে গিয়া শত শত অশ্বারোহী সৈন্য হরাইলেন। আকবর অবশ্য এত সুলভ বিজয়ে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি এই অবস্থার একেবারে শেষ করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। শুধু কাবুলকেই পরাজিত করিলে হইবে না, বাংলা রহিয়াছে, আর শুধু তাই নয়, ঘরেই প্রচুর বিশ্বাসঘাতক। তাঁহার ধাত্রীপুত্র মীর্জা আজিজ কোকো-কে বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইয়া দিয়া তিনি অসামান্য যত্নের সহিত কাবুল যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি শাহ মন্‌সুরকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি যে ষড়যন্ত্রের সমস্ত

ব্যাপার জানেন তাহা তাহাকে জানিতে দিলেন না। বলিলেন যে তিনি একজন যোগ্য অর্থসচিবকে শুধু সন্দেহবশতই কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। শাহ মন্‌সুরকে অভিযানে সঙ্গে লওয়া হইল।

কিছুই ভাগ্যের হাতে ফেলিয়া রাখা হইল না। বঙ্গ ও গুজরাটের শাসনকর্তাদের জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখা হইল, বড় বড় শহরে সৈন্য রাখিয়া যাওয়া হইল। সম্রাট তাঁহার দুই পুত্র—সেলিম ও মুরাদকে সঙ্গে লইলেন। আর সঙ্গে রহিলেন মুরাদের শিক্ষক মনসারেট, তাঁহার কয়েকজন প্রধান পত্নী, কিছু পরিমাণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য; জিনিসপত্র বহনের জন্য হাতী এবং উট। তাহার পরই যথারীতি মৃগয়ার ঘোষণা হইল। রাজধানী হইতে চারমাইল দূরে সম্রাটের জন্য অতি শুভ্র শিবির রচনা করা হইল। চেঙ্গিস যে রীতিতে সৈন্য এবং প্রধান ব্যক্তিদের শিবির পাতিবার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেই মোঙ্গলীয় রীতিতে সৈন্য এবং প্রধান ব্যক্তিদের শিবির সন্নিবেশ করা হইল। কোন রোমান শিবিরেও ইহা অপেক্ষা বেশী শৃঙ্খলা বা এত নিয়মিত রীতির ব্যবস্থা করা হইত না। সৈন্যদের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে বাজার রাখা হইল। রাত্রে একটি উচ্চ-স্তম্ভের উপর আগুন জ্বালানো হইত। তাহাতে দলভ্রষ্ট সৈনিকরা নির্দেশ পাইতে পারে এবং কোন গোলমাল হইলে সেখানে আসিয়া সবাই দলবদ্ধ হইতে পারে।

১৫৮১র ৮ই ফেব্রুয়ারি অভিযান শুরু হইল। প্রথম দুইদিন চিতা শিকার হইল। শিকার যেন আসন্ন কাজের প্রস্তুতি,—সৈন্যদের প্রত্যেক দলের যথার্থ কাজ এবং যথাযথ স্থান গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া। প্রত্যেকদিন কতটা অগ্রসর হইতে হইবে তাহা সযত্নে মাপিয়া ঠিক করা হইল। এই মাপজোক বিভিন্ন সুবার

আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করিতে এবং যাত্রার সময় ঠিক করিবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। রণভেরীর তালে তালে সৈন্যবাহিনী তাহার বিপুল সারসরঞ্জাম লইয়া এক রাজকীয় শোভাযাত্রার মত অগ্রসর হইতে লাগিল—হস্তীবাহিনী, তীরন্দাজ, বর্শাবাহী সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্য। পদাতিক বাহিনী কিছু অল্পসংখ্যক ছিল। ইহা ছাড়া আকবর আর সব কিছুই অধিক পরিমাণে লইয়াছিলেন। আকবর সর্বদাই যুদ্ধে হস্তী আরূঢ় এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর বিশ্বাস করিতেন। ইহা জেস্যুইটদের বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল সৈন্য বুঝি নিতান্তই অল্প কিন্তু ক্রমেই তাহা এত দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করিল যে মনে হইল বুঝি সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। এত লোককে খাওয়াইতে হইবে, অথচ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম,—এ-আকবরের দূরদৃষ্টির ফল। পূর্বেই বিভিন্ন দিক হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ব্যবসায়ীগণকে বলা হইয়াছিল তাহারা সস্তায় জিনিস বিক্রয় করিলে তাহাদের করমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

সীমান্ত পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা বদলাইয়া গেল। পথে সে সকল রাজাদের রাজ্য পড়িবে তাহাদের নিকট বন্ধুত্বমূলক পত্র লইয়া দূত পাঠান হইল। যাহারা বাধা দিবে তাহাদের সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। সৈন্যদের খাদ্যসামগ্রী দাম দিয়াই কিনিয়া লওয়া হইল এবং সৈন্যদের খাদ্যের সুবন্দোবস্তই হইল। অবশ্য জল সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতে হইল। আকবর সমতলভূমি দিয়া সৈন্য না লইয়া গিয়া পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে জলস্রোত অফুরন্ত সেখান দিয়া সৈন্য চালনা করিলেন। কারিগর এবং মজুরদের পথ নির্মাণ করিবার জন্য আগে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সৈন্যবাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়াব মহম্মদ কাশিম খাঁর উপর ইহার ভার ন্যস্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে আকবরেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। আকবর তাহা জানিতেন। কিন্তু লোকের সঙ্গে কি করিয়া কাজ করিতে হয় আকবর তাহাও জানিতেন। ইঞ্জিনিয়ার বুঝিতে পাবিলেন যে তিনি আকবরের পক্ষে আসিযা ভালই কবিয়াছেন। নদীর উপবে নৌকা দিয়া সেতু নির্মাণ করা হইল, তাহার উপবে যাহাতে একসঙ্গে বেশীলোকের চাপ না পড়ে তাহা দেখিবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত কবা হইল। সৈন্যঘাঁটি এবং প্রহরীদের ব্যবস্থা করা হইল। সৈন্যবাহিনীব গতি অব্যাহত রহিল। সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত কঠিন নিয়মানুবর্তিতার ব্যবস্থা করা হইল।

শোনপথের নিকট শাহ মনসুবকে লেখা মহম্মদ হাকিমের একটি চিঠি গোপনে খোলা হইল। এই লইয়া তৃতীয়বার তাহাব বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়িল। চিঠিগুলি জাল হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ ছিল, কিন্তু শাহ মনসুরেব বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না বা সামান্য সংশয় থাকিতে পারে। শাহ মনসুরকে আবার বন্দী করা হইল। কয়েকদিন পরে তাহাকে একজন প্রহরী বাহিরে আনিল। সঙ্গে আসিলেন সম্রাট ও তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণ। সৈন্যদের থামিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। আবুল ফজলকে বলা হইল শাহ মনসুর তাহার প্রথম জীবনের ক্ষুদ্র কেরানীপদ হইতে আজ পর্যন্ত কত সুযোগ ও সম্মান পাইয়াছে তাহা সকলকেই পড়িয়া শোনান হউক। তাহার পর আনা হইল তাহার নিজের চিঠিপত্র, বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ। তাহার পর একটি গাছে তাহার ফাঁসী দেওয়া হইল। বিষণ্ণমুখে সম্রাট শিবিরে

ফিরিয়া আসিলেন। এই নিষ্ঠুরতা তাঁহার ভাল লাগে নাই বলিয়া না একজন সুদক্ষ অর্থমন্ত্রীকে হারাইলেন বলিয়া?—কেহই উত্তর দিতে পারিবে না। সৈন্যবাহিনী এই সংবাদটি অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে শুনিল। তাহারা অনুভব করিল যে ষড়যন্ত্রের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। মহম্মদ হাকিম যখন এই সংবাদ শুনিলেন বুঝিলেন যে সবই শেষ হইয়া গেল, এখন তিনি কিভাবে সন্ধি করা যায় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রবল ঝড়ের মধ্যে রাস্তা চলা দায় হইয়া উঠিল, বাধ্য হইয়া সৈন্যদের থামিতে হইল। যে মুহূর্তে আবহাওয়া পরিষ্কার হইল দলের একটিমাত্র ইউরোপীয় দূরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় এই প্রথম দর্শন করিলেন। তিনি যে সব দেশের উপর দিয়া যাইতেছিলেন সেই সব দেশের পরিবেশ ও লোকজন পর্যবেক্ষণ ও তাঁহার লেখায় রত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মসাধনার ক্রুটি করেন নাই। প্রায়ই হিন্দু মুসলমান উভয়দলের সহিত ধর্মীয় আলোচনায় যোগ দিতেন। তাঁহার নিজের ধারণায় এই আলোচনার মধ্য দিয়া কিছু সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জেস্যুইটদের প্রধান উদ্দেশ্য—সম্রাটকে ধর্মান্তরিত করা—ভুলিয়া যান নাই। যখন খবর আসিল যে মহম্মদ হাকিম কাবুলে পলায়ন করিয়াছে মনসারেট ভাবিলেন এই আসল সময়। তিনি এতদিন সম্রাটকে যাহা শিখাইয়াছেন তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা-বর্ণনা রচনা করিয়া সম্রাটকে দিলেন। এখন সিন্ধু নদীর তীরে তাঁহারা আসিয়াছেন। নৌকা ব্যতীত এই ঋতুতে নদী পার হওয়া অসম্ভব। যথেষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রায় পঞ্চাশদিন যাত্রা বন্ধ রহিল। আকবর এই

অবকাশ সময়ে তাঁহার প্রিয় আলোচনায় সময় কাটাইতে লাগিলেন। তাহাছাড়া যথারীতি আমোদপ্রমোদ, শিকার ও ক্রীড়া ছিল। তিনি পূর্বের মতই এখনও বাইবেলের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু আগের মতই এখনও ধর্মান্তরিত হইবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি মনসারেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহম্মদ হাকিমকে তিনি আর অনুসরণ করিবেন কি না। মনসারেট উত্তর দিলেন, 'যেখানে আছেন সেখানে থাকুন, আর অগ্রসর হইবেন না, তিনি আপনারই ভাই। প্রতিহিংসার গৌরব অপেক্ষা করুণার গৌরব অনেক বেশী'। সম্রাট উত্তর শুনিয়া খুশি হইলেন কিন্তু ভাইকে শিক্ষা দিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য তাঁহার মনে কোন প্রতিহিংসাবৃত্তি ছিল না। তিনি রাজকুমার মুরাদকে কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচশত হস্তীসহ অগ্রসর করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে এবং অন্যান্য উপলক্ষেও আকবরের কুসংস্কার এবং বিশেষ করিয়া জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং শুভদিন নির্ণয় ব্যাপারে আকবরের বিশ্বাস দেখিয়া মনসারেট বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুরাদ যাইবার দুইদিন পরে সম্রাট মনসারেটকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা আলোচনা করিলেন তবে শুধু ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলেন না, ইউরোপের ভৌগোলিক বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ভূমণ্ডলে ভারতবর্ষ ও পর্তুগালের অবস্থান সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য, বিবাহ, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার পর উঠিল শেষবিচারের কথা। আবুল ফজল বাইবেলের উপদেশ ও নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে কোরানের কথাও উঠিল। সম্রাট খ্রীষ্টীয় ত্রি-তত্ত্বের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়সত্তা সম্বন্ধে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে

পারিতেছিলেন না, কিন্তু রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিতেছিল বলিয়া মনসারেট সে সম্বন্ধে আর নূতন কথার অবতারণা করিলেন না। আকবরের কিন্তু ক্লান্তি নাই, পরদিন তিনি ঠিক সময়েই উঠিলেন। মৃগয়া, কাঠের মিস্ত্রির কাজ, অজস্র নির্দেশ দান এবং সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শন তিনি সবই করিলেন।

ইতিমধ্যে মহম্মদ হাকিম খুবই ভীত হইয়া সন্ধিপ্রস্তাবের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আকবরের এক খুল্লতাত ফীরতুন খাঁর ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতার বলে মহম্মদ কিছুটা প্রভাবিত হইলেন। তিনি আকবরকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, তিনি বুঝাইলেন মুঘলসৈন্যবাহিনী একদল কাফের ও পৌত্তলিকের সমষ্টিমাত্র। তাঁহার উৎসাহেই মহম্মদ হাকিম আকবরকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। কাজেই আকবর তাঁহার অভিযান অব্যাহত রাখিলেন। সিন্ধুনদী পার হইতে প্রচণ্ড কষ্ট এবং প্রচুর সময় লাগিল। শুধুই যে নৌকা কম ছিল তাহা নহে, মনসারেট বিরক্তির সঙ্গে লিখিয়াছেন, অশুভ চিহ্নের জন্য তুইদিন আকবর নদী পারাপার বন্ধ রাখিলেন। যাহা হউক, অবশেষে সৈন্যদল নদী পার হইল। ওপারে গিয়া যতদিন না রাস্তা তৈয়ারী হয় ততদিন যাত্রা বন্ধ থাকিল। এই সময়ে আকবর কারখানায় এবং ধর্মীয় বিতর্কে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পেশোয়ারে অবিলম্বে পৌঁছিলেন; খবর আসিল যে মুরাদের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ হইয়াছিল, শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে কিন্তু মুঘলসৈন্য ভয়াবহ ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক সেনানায়কদের ব্যক্তিগত সাহস এবং অন্য একদল সৈন্যের আগমনের ফলে মুঘলরা পরাজয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। মুরাদ মুঘলরণনীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন:

অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনভাগে ভাগ করিয়া, দক্ষিণে, মধ্যে এবং বামে—অর্ধচন্দ্রাকারে সৈন্য সাজাইয়া পিছনে রাখিয়াছিলেন পদাতিক বাহিনী, আর তাহার পিছনে হস্তীবাহিনী। মনসারেট-এর লেখা হইতে রণক্ষেত্রে হস্তিদের অসুবিধাজনক আচরণের বর্ণনা পাওয়া যায়; তাহাদের চালনা করা কঠিন, শত্রুসৈন্যদের অপেক্ষা নিজের পক্ষের প্রতি তাহারা অনেক সময়ই বিপজ্জনক। তাহারা প্রথমে ভয় পায়। তবে অশ্ব দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহাদের পক্ষে আব ভয় থাকে না। যখন হস্তী আহত হয় তখন আর তাহারা শত্রুমিত্রেব প্রভেদ করে না।

সংবাদ পাইয়াই আকবর সিন্ধুনদীর পথ রক্ষা করিবার জন্য বেশ কিছু সৈন্য রাখিয়া দ্রুতবেগে কাবুল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কুমার সেলিম তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করিলেন। সৈন্যবাহিনী খাইবার গিরিপথে পৌঁছিল। ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের পরিশ্রম সত্ত্বেও সৈন্যদের এই গিরিপথ পার হইতে প্রচুব কষ্ট হইল। নয়-ই আগস্ট আকবর তাঁহার পিতামহ বাবরের রাজধানী কাবুলে পৌঁছিলেন। মহম্মদ হাকিম পলাইয়া এক উচ্চ ও দুরারোহ পবতে লুকাইলেন।

কাবুলে এক সপ্তাহ কাটিল। আকবর শহরবাসীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিলেন। তিনি নাগরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের সিংহাসনে গর্বভরে বসিলেন। অভিযানের সাফল্যে তিনি খুশি। তাঁহার বোন তাঁহার নিকটে আসিয়া ভাই-র জন্য মিনতি করিলেন, সে এখন অপরাধেব জন্য অনুতপ্ত, তাহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হউক। আকবর বলিলেন যে তিনি বোনকে ভালবাসেন, তাহার আনুগত্য এবং

দক্ষতায় তিনি খুশি, এই রাজ্য তিনি তাহাকেই দিবেন। আর মহম্মদ হাকিম! তিনি তাহার নামও শুনিতে চাহেন না, সে কাবুলেই থাকুক বা যেখানেই থাকুক তিনি সেজন্য চিন্তিত নন। শুধু বোনকে বলিয়াছিলেন যে সে যেন আবার কোন ষড়যন্ত্র না করে এজন্য সাবধান করিয়া দিও, তাহা না হইলে সম্রাট তাহাকে আর দয়া করিবেন না। আকবর তাহাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে পারিতেন কিন্তু করিলেন না। সব ব্যবস্থা হইলে আকবর ফিরিবার আয়োজন করিলেন। পয়লা ডিসেম্বর আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ফিরিয়া আসিলেন।

মনসারেট এই অভিযানে আকবরের বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, শাসনকার্য পরিচালনা ক্ষমতা এবং তাঁহার দয়ার্দ্রমনের পরিচয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এগুলি বাহিরের দিক ; সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে সৈন্যদের যে বিশাল এবং অতিকায় ব্যবস্থার আয়োজন হইয়াছিল তাহাতেও বিস্মিত হইবার কথা। আকবর তাঁহার কাজ বুঝিতেন, এবং যে ধরনের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তাহার উপযোগী যুদ্ধরীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার গুজরাট অভিযানে দেখিয়াছি প্রয়োজন হইলে আকবর অতুলনীয় ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুপক্ষকে আঘাত হানিতে পারিতেন। দ্রুত আক্রমণ এবং অতর্কিত আক্রমণ দুইই প্রয়োজনীয়। কাবুল অভিযানের সময় যে বিপুল যত্নের সহিত সৈন্যদের প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং যে পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, মনে হয়, আকবর নিজেও জানিতেন তাঁহার শত্রুর পক্ষে এত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তখন অবস্থা এইরূপ যে পরাজয় হইলেই অবস্থা অতি সংকটজনক হইতে পারে, শুধু তাঁহার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে

নয়, তাঁহার সিংহাসন, তাঁহার বংশের পক্ষেও। কাজেই এত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া তাঁহার সৈন্যদের পার্বত্য অঞ্চলে অগ্রসর হইতে হইবে, আর পার্বত্য অঞ্চল রক্ষণভাগের দিক হইতে শত্রুপক্ষের সুবিধাজনক। আকবর হয়ত আরও ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন কিন্তু একজন কর্মঠ এবং দক্ষ শত্রু তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারিত।

১৩

কাবুল দরওয়াজার সম্মুখে মনসারেট সম্রাটকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তখন আকবরের আনন্দের প্রসঙ্গে তিনি কিছুটা বিস্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন যে যশোলাভে আকবর আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার খ্যাতি মনসারেট-এর মাধ্যমে স্পেনে পৌঁছিবে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় আকবর যেমন তাঁহার প্রজা-পুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন ধর্মমত উদ্ভাবনের চিন্তা করিতেছিলেন, তেমনই ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির সহিত যোগাযোগ করিতেও আগ্রহী হইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে ঠিক কতটা গুরুত্ব দিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, কিন্তু একটি উদ্ভট প্রস্তাব দিয়া ইউরোপে দূত পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি পর্তুগালের পক্ষ হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন। তিনি পোপকেও একটি পত্র লিখিয়া ছিলেন। তিনি মনসারেটকে একজন দূত করিতে চাহিয়াছিলেন। সৈয়দ মুজাফ্‌ফর তাঁহার সহিত যাইবেন। কিন্তু আকুয়াভিভার কি হইবে? ঠিক হইল যে তিনি থাকিবেন এবং মনসারেট-এর পরিবর্তে বালক মুরাদের শিক্ষক হইবেন। জেসুইটদের কেহই সুখী হইলেন না, যদিও তাঁহারা সম্রাটের মতে সম্মতি দিতে বাধ্য বোধ করিলেন। এই দৌতকার্য অবশ্য গোয়ার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সৈয়দ মুজাফ্‌ফর প্রথম হইতেই যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনি পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্যে লুকাইলেন। দৌতকার্য বন্ধ হইয়া গেল। মনসারেটকে তাঁহার মিশনের প্রধান আবিসিনিয়ায় গমন করিতে আদেশ দিলেন। সমুদ্রপথে তিনি আরবদের হাতে বন্দী হইলেন।

পরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া রুগ্ন দেহে মারা যান।

আর আকুয়াভিভা! তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ও মনসারেট যে বিপুল আশা লইয়া যে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন তিনি যাইতে চাহিলেন। তিনি দৃঢ়-নিশ্চিত যে সম্রাট কোনদিন ধর্মান্তরিত হইবেন না। বৃথাই আবুলফজল বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে সম্রাট তাঁহার রাজসভায় বিদেশীদের পছন্দ করেন। আর অন্য সব বিদেশীদের মধ্যে তাঁহাকেই আকবর সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। বৃথাই তিনি বুঝাইলেন যে বাইবেলের প্রতি সম্রাটের অসাধারণ শ্রদ্ধা, একদিন তাঁহাকে একটি কোরান ও একটি বাইবেল দেওয়া হইয়াছিল, কোরানটির বাইবেল অপেক্ষা অনেক মূল্যবান বাঁধাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাইবেলটির প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধার প্রকাশ হইয়াছিল অনেক বেশী। এইসব তুচ্ছ কথায় আকুয়াভিভা বিষাদের হাসি হাসিলেন। তাঁহার স্বভাব ছিল চিরকালই মধুর—এমনকি হিন্দুরাও তাঁহাকে 'দেবদূত' বলিত। তিনি যাইবার জন্য মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। আকবরের কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তনের একদুই বৎসর পরে তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য মিশনের প্রধানকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন। দুঃখিত সম্রাট তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দিলেন। সঙ্গে দিলেন দেহরক্ষার জন্য একজন প্রহরী। ১৫৮৩-র মে মাসে তিনি গোয়ায় উপনীত হইলেন। দুইমাস পরে তিনি একদল হিন্দু কর্তৃক নিহত হন (অবশ্য, একথা সত্য যে তাহাদের মন্দির খ্রীষ্টান পুরোহিতগণ ধ্বংস করিয়াছিল এবং উত্তেজিত হইবার কিছু কারণ তাহাদের ছিল)। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মের

জন্য মৃত্যুর কামনা করিতেছিলেন। অবশেষে কামনা পূর্ণ হইল।

ইউরোপে দৌত্য শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হইল। কিন্তু সেই বৎসরই ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপখণ্ডের একপ্রান্ত হইতে দৌত্যের চেষ্টা হইল। সেই চেষ্টা হইল এইবার ইংলণ্ড হইতে। আকবরের খ্যাতি ইতিপূর্বেই আমাদের সুদূর দ্বীপে উপনীত হইয়াছিল। রাণী এলিজাবেথ আকবরকে এক পত্রে "সম্পূর্ণ অপরাজেয় এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিমান রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরে যে দুইটি দেশ এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এই প্রথম ভাব বিনিময়। জন নিউবেরী নামক এক লণ্ডনের বণিককে দূত নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি আকবরের রাজসভায় কীভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন জানা যায় না। সতের বৎসর পর রাণী এলিজাবেথ জন মিল্ডেন হল নামক একজন দূত পাঠাইয়া পর্তুগীজদের মতই বাণিজ্য করিবার সমান অধিকার চাহিলেন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়, কিন্তু আকবর যখন জেস্যুইটদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁহারা অত্যন্ত ক্রোধে সমস্ত ইংরেজদের গুপ্তচর ও তস্কর বলিয়া নিন্দা করেন। মিল্ডেন হলও জেস্যুইটদের নামে অভিযোগ করেন যে তাঁহারা রাজসভার লোকজনদের তাঁহার বিরোধিতা করিবার জন্য উৎকোচ প্রদান করিয়াছেন। হয়ত তাঁহার অভিযোগ ভিত্তিহীন কিন্তু সমস্ত ঘটনাই অত্যন্ত কটু। আকবর-আকুয়াভিভা সম্পর্কের সে কাল হইতে এই কালের পরিবেশ কত ভিন্ন! কিন্তু এইরূপ ঘটনার লক্ষণ পূর্বেই দেখা দিয়াছিল। আমরা ১৫৮২-র অবস্থা পর্যালোচনা করি।

উপাসনাভবনের আলাপ আলোচনায় ভাঁটা পড়িয়া আসিয়াছিল। কাবুল অভিযান হইতে ফিরিবার পর তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর এমন দিন আসিল যখন আকবর দেখিলেন সেই উপাসনাভবনে জেসুইটগণ ব্যতীত কেহ নাই। শূন্য গৃহে তাহাদের বিরোধিতা করিবার বা তাহাদের প্রশ্ন করিবার কেহই নাই। আকবর নিজের ব্যর্থতা বুঝিয়া সেই উপাসনাভবন ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এই সব আবেগহীন বিতর্কে কোন ফল হয় নাই, কোন মতের ঐক্য হইল না, বরং পার্থক্যকে তিক্তকর করিয়া তুলিল। তবুও আকবর নিজের বিশ্বাসে একাগ্র রহিলেন। মনে হইতে লাগিল যদি ধর্মের ক্ষেত্রে আর কিছু করিতে হয় তবে তাঁহার জীবনেই তাহার সূচনা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া তোলাই ছিল আকবরের চরম আকাঙ্ক্ষা। বলেই হউক, আর মহিমার আকর্ষণেই হউক বিশাল দেশকে এক শাসনের অঙ্গীভূত করাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন। তাঁহার মধ্য এশিয়ার পূর্বপুরুষদের মত শুধু জয় ও পদানত করা, শুধু শক্তির উপর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কারণ তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর অনিবার্য-ভাবেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের পর রাজ্য গাঁথিয়া, দৃঢ় এবং ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি একজন বিদেশী, একজন মুসলমান, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের সহিত একাত্মতাবোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মের বিভিন্নতা তাঁহার সম্মুখে অত্যন্ত জটিল সমস্যা ও বাধার সৃষ্টি করিল। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য কোন ধর্মমত সৃষ্টি করা কি সম্ভব ?

যত ধর্মের কথা তিনি জানিতেন সকলেরই পরিচয় লইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন সকলেরই মধ্যে ভাল আছে, সব ধর্মেই ভাল লোক আছে। বাইবেলের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছাড়াও খ্রীষ্টধর্মে যে আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহার কারণ বোধহয় তিনি এই ধর্মেই তাঁহার সমস্ত প্রজাদের পক্ষে এক ধর্ম গ্রহণ করার সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন। কারণ এই ধর্মটি তাঁহার সকল প্রজার নিকটেই নূতন। কিন্তু যদি এরূপ চিন্তা কখনও করিয়াও থাকেন, খ্রীষ্টধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতার পর বুঝিতে পারিলেন এরূপ আশা কত নিরর্থক। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের পরস্পরের শত্রুতা অতি ভয়াবহ এবং অতি গভীর। আর ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানে রাজনৈতিক উগ্রতা, উচ্চাভিলাষ ও ষড়যন্ত্র মিশনারীদের সমস্ত সাফল্যকে বিনষ্ট করিবার পূর্বে যেমন সাদরভাবে খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব অভ্যর্থিত হইয়াছিল, হিন্দুরা তেমন সৌজন্য দেখান নাই। তাহা হইলে এবার কোন দিকে তাকানো যায়? কোথায় পথ? তিনি আংশিকভাবে ভারতবর্ষের সব প্রধান ধর্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই তাঁহাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় নাই, ভারতবর্ষের ঐক্যচিন্তা তখনও তাঁহার মনে বিরাজ করিতেছিল।

আকবরের প্রিয়বন্ধু আবুলফজলের পিতা শেখ মুবারক ছিলেন পণ্ডিত, উদারধর্মতত্ত্ববিদ। তিনিই একদা আকবরের মনে এই চিন্তার বীজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে শুধু এই সাম্রাজ্যের পার্থিব শাসনকর্তা নয়, আধ্যাত্মিক জগতেরও পরিচালক হইতে আবেদন করিয়াছিলেন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। আকবর অন্তরে ছিলেন মরমী। ধর্মের বাহিরের রূপের সহিত কিছুতেই নিজেকে মিলাইতে পারিতেন না। নিজেই এক

আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রয়োজনীয় প্রতীক সন্ধান করিতে লাগিলেন। আর, কেনই বা করিবেন না? তিনি নিজেই সাম্রাজ্যের সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের ঐক্যের প্রতীক। ঈশ্বর এক, সকল বিরোধী-ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উপাস্য বিষয়। আকবর তাঁহার সকল প্রজার সকল কাজের দায়িত্বভাগী, তিনি এক ভগবদ্ ধারণার পার্থিব প্রতিনিধি। তিনি ছাড়া আর কেহই এই কাজ করিতে পারিবেন না। অবশেষে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘলালিত ভাবনা ফলে পরিণত হইল। তিনি নূতন ধর্মমত প্রচার করিলেন। এই ধর্মমত সকল ধর্মের বিরোধিতা দূর করিয়া একাকার করিবে।

এই বৎসরই তিনি কাবুল অভিযান শেষ করিয়া ফিরিয়াছেন। বঙ্গদেশের বিদ্রোহ লইয়া আর চিন্তা নাই। রাজসভার বিশ্বাস-ঘাতকতা দৃঢ়ভাবে দমন করা হইয়াছে, রাজ্য আক্রমণের ভয় চলিয়া গিয়াছে। আকবর এখন নিরাপদ; সমস্ত বিরোধিতা অস্বীকার করিবার মত শক্তি তাঁহার আছে। তিনি একটি সাধারণ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়া তাঁহার ধর্ম সম্পর্কিত নূতন চিন্তা ব্যক্ত করিলেন। বিভিন্ন ধর্মমতের অনৈক্য কীভাবে রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "সমস্ত ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এমনভাবে এই কাজ করিতে হইবে যে তাহাতে সকল ধর্মের 'সব কিছুই' থাকিবে, আবার 'কিছুই থাকিবে না'। তাহার ফলে প্রত্যেক ধর্মের ভালটুকু যেমন আমরা হারাইব না, তেমনই অন্য ধর্মের যাহা আরো ভাল তাহাও লাভ করিব। এই পথেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে, প্রজাপুঞ্জের শান্তি হইবে আর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা আসিবে।"

এই নূতন ধর্ম দীন-ইলাহী অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। ব্যর্থ হইতে

বাধ্য। ধর্মসমাজে সহনশীলতা কোন গুণ নহে। তাহা উৎসাহ-হীনতা ও উদাসীনতার ঘৃণিত সন্তান। এত সহজ একটি ধর্মমত স্বভাবতই অস্পষ্ট ও শূন্যগর্ভ বলিয়া নিন্দিত হইল। সর্বাপেক্ষা বেদনার বিষয় এই যে 'ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান' রূপে আকবরের এই আধ্যাত্মিক ভূমিকাকে বৈষয়িক দিক হইতে সন্দেহজনক মনে করা হইল। কিন্তু আকবরের এই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন নয়। যাঁহারা ইহার মধ্যে শুধুই আত্মম্ভরিতা এবং চতুরালী দেখিয়াছেন তাহারা নিঃসন্দেহে আকবরের চরিত্রকে ভুল বুঝিয়াছেন।

সকল ধর্মকে এক করিবার জন্য যে ধর্ম রচিত হইল তাহা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিল না। আর মনুষ্য চরিত্রের এমনই দুর্বলতা, যে আকবর তাঁহার পিতৃপুরুষদের অসহিষ্ণুতার চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে এতদূর বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তিনিই মুসলমানদের বহু আচারের বিরুদ্ধে কঠিন নির্দেশ দান করিয়া নিজের সহনশীল চরিত্রের উপর দুর্নাম দিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের উদ্গাতাগণ যেমন অনেক সময়েই নিজের দেশের প্রতি বিশ্বমৈত্রী-ভাবপূর্ণ আচরণ করেন না, বরং একটু নির্দয় দৃষ্টিতেই তাকান; তেমনই সমস্ত পরধর্মের প্রতি প্রবল ঘৃণাকারী দিগ্বিজয়ীদের এই বংশধর নিজের ধর্মকেই নিপীড়িত করিয়াছিলেন। যতই দিন গিয়াছে ততই মুহম্মদ ও তাঁহার সমগ্র ধর্মনীতির বিরুদ্ধে তাঁহার বিরাগ তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়াছে। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট পিন্‌হিয়ারো লাহোরে দেখিয়াছেন না আছে একটি মসজিদ, না আছে একটি কোরান। যে কয়টি মসজিদ ছিল তাহাও অশ্বশালায় পরিণত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "সম্রাট নিজে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেকেই এক ধর্মনেতা রূপে

উপস্থিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই অনেক লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে কিন্তু ইহা শুধু তিনি তাঁহাদের অর্থ দিয়াছেন বলিয়াই। তিনি ভগবানকে পূজা করেন, সূর্য পূজা করেন। তিনি একজন হিন্দু। তিনি জৈন সম্প্রদায়েরও অনুসরণ করেন।" দীন-ইলাহী প্রচারের তের বৎসর পরও আমরা দেখি আকবর এখনও বিভিন্ন ধর্মের নানারূপ আচার পালন করেন। এই নূতন ধর্মের কেন্দ্রমূলে সম্রাট স্বয়ং থাকা সত্ত্বেও অল্পই প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ইহার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারেই যে মুসলমানগণ সর্বদাই তাঁহার ধর্মজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধিতা করিয়াছে তাহারাই প্রতিশোধ লইতেছে।

এই আশাভঙ্গের জন্য আকবর কিরূপ অনুভব করিয়াছিলেন আমরা জানি না। সম্ভবত তিনি আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং সভার স্বার্থান্বেষীগণ ও চাটুকারগণ তাঁহার সাফল্যকে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি নিঃসন্দেহে ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার এই রাজকীয় সত্তার মধ্যেই ঈশ্বরের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবনা ইউরোপের ইতিহাসে অপরিচিত নয়। কিন্তু একথা খুবই স্পষ্ট যে ধর্মনায়কের প্রতিভা তাঁহার ছিল না। তবে তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহ্যিক এবং বৈষয়িক ঐক্যের আদর্শ তিনি এখনও অনুসরণ করিতে পারেন। আর এই ক্ষেত্রে তাঁহার কুশলতা প্রশ্নাতীত।

সাম্রাজ্য এখনও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বিস্তৃত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতবর্ষের বিশাল অঞ্চল তাঁহার আধিপত্যের বাহিরে, আর উত্তর ও পশ্চিমের অনেক রাজ্যের প্রতিই তাঁহার লুব্ধদৃষ্টি। কাশ্মীর ও সিন্ধুর দিকে তিনি প্রথমে দৃষ্টি দিলেন। কাশ্মীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল তবে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। প্রথম তিনি নিজে আর যুদ্ধাভিযান চালনা করেন না, আর শাসক হিসাবে একটু দুর্বলতা তাঁহার ছিল কারণ সেনাধ্যক্ষদের তিনি সর্বদা বিজ্ঞভাবে নির্বাচন করেন নাই। তিনি অভিযানে তিনটি সেনাপতি পাঠাইলেন। তিনজনের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। খুবই স্বাভাবিক কারণ তাঁহাদের একজন হইতেছেন বীরবল। তিনি আকবরের অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত বন্ধু খুবই সত্য, কিন্তু তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, বিদূষক, ঠিক সৈনিক বা সেনাধ্যক্ষ নন। ঠিক ভাবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া অভিযান চালনার ফলে তাঁহারা গিরিপথে অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন। আকবর তাঁহার আট সহস্র সৈনিকের মৃত্যুর ক্ষতি শান্তভাবে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বীরবলকে হারাইবার ক্ষতি সহ্য করিতে পারা কঠিন। বীরবল এই যুদ্ধে নিহত হন। বীরবল, তাঁহার প্রিয় বীরবল, তাঁহার আনন্দময় বয়স্য, তাঁহার কণ্ঠস্বর—তিনি যখন কথা বলিতেন, সন্ধ্যায় স্বরচিত গান গাহিতেন—আজও তাঁহার কানে লাগিয়া আছে। বীরবল—তাঁহার জন্য তিনি ফতেপুর সিক্রিতে এত সুন্দর একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন; বীরবল—একমাত্র হিন্দু যিনি সম্রাটের দীন-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আকবর আজ জীবনের সেই পর্যায়ে আসিয়াছেন যখন যৌবনের বন্ধুরা একে একে মারা যায়। এখন কালের আঘাত নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

কাশ্মীর পরাজিত হইল। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আকবর লাহোর হইতে শ্রীনগরে পৌছিলেন, সেখান হইতে গেলেন কাবুলে। কাবুলে দুইটি মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া অতি গভীর ভাবে অভিভূত হইলেন। একজন ভগবান দাস। ইনিই প্রথম রাজপুত যিনি মুঘলসৈন্যদলে যোগ দিয়াছিলেন, আকবরের পাশে দাঁড়াইয়া চিতোর ও গুজরাটে এই সাহসী সৈন্যটি যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন টোডরমল, সাধারণ কেরানী হইতে তিনি প্রধান সচিব হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আকবরের অন্যতম প্রধান বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ।

সিন্ধু অভিযান পরিচালনা করিলেন আকবরের রক্ষক বৈরামখানের সুযোগ্য সন্তান আবদুর রহিম। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর আকবর তাঁহাকে সাদরে আনিয়া মানুষ করিয়াছেন। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর রাজ্য-জয়ের পরিকল্পনা আপাতত কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ হইল। পর বৎসর পশ্চিমে উড়িষ্যাও সাম্রাজ্যের মধ্যে আসিল। চারিবৎসর পরে কান্দাহারও সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল।

দাক্ষিণাত্য এখনও বাকী। সম্রাট হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার নামডাক এখন এমনই প্রচণ্ড যে দাক্ষিণাত্যের শাসকবর্গ আক্রমণাত্মক অভিযানের শ্রম ব্যতীতই তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিবেন। এই অঞ্চলের অধীনতাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার

করিতে—সেই স্থানগুলি হইতে তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের উপকূলের উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন। তিনি এইসময় আবার পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দ্বিতীয় জেস্যুইট দল ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজসভায় আসিয়াছিল। ঐ দলের বেশীদিন থাকা হয় নাই, কিন্তু তিনবৎসর পরে আবার একটি দল আসে। এই তৃতীয় দলের প্রধান ছিলেন ফাদার জেরোমি জেভিয়ার। এই রাজসভায় তিনি আকবর ও তাঁহার পরবর্তী রাজার সহিত প্রায় তেইশবৎসর অতিবাহিত করেন। আকুয়াভিভা ও মনসারেট-এর মতই সম্রাটের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা হয়। তবে সেই বিশ্বাস ও সেই বন্ধুত্ব আর হয় নাই। আকুয়াভিভা ও মনসারেট ছিলেন সৎ ও ধর্মে উৎসর্গিত প্রাণ। তাঁহাদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচারই ছিল সব। পরবর্তী জেস্যুইটদের মধ্যে ধর্মে উৎসাহ ছিল ঠিকই; কিন্তু তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের উদ্দীপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ বোধ মিশিয়াছিল। তিনটি জেস্যুইট দলই অবশ্য তাঁহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধনে—সম্রাটের ধর্মান্তরে—ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ের পরিকল্পনার প্রথম চাল চালিলেন এইভাবেঃ প্রথমে চারিটি রাজ্য বাছিয়া লইয়া চারজন দূত পাঠাইলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজে জয়-সাধ্য রাজ্য হইল খান্দেশ (বুড়নপুর তাহার রাজধানী), আর আহ্‌মদনগর। দীর্ঘকাল পরে দূত যে বার্তা লইয়া ফিরিল তাহা বিশেষ আশাপ্রদ মনে হইল না। আহ্‌মদনগরের শাসক অতি সামান্য ও তুচ্ছ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট কারণ মনে করা হইল। সিন্ধু-বিজেতা আবদুর রহিম হইলেন সেনাধ্যক্ষ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গে যুগ্মসেনাপতি করা হইল যুবরাজ মুরাদকে এবং ফলে অনিবার্য ভাবে বিবাদ আরম্ভ হইল। যে মুরাদের বুদ্ধি ও নম্রতা তাঁহার শিক্ষক মনসারেটকে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই মুরাদ এখন মগ্ন এবং নানা নেশার দাস। ইহাই পারিবারিক দোষ। বাবর দীর্ঘকাল মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। পুষ্পশোভিত প্রান্তর বা সুন্দর সূর্যাস্ত দর্শনের আনন্দ মদ্যপানের দ্বারা প্রকাশ করিতেন। এই ছিল তাঁহার যুক্তি। যদিও প্রয়োজনের সময় দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে মদ্যপান একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন অহিফেন সেবনের ফলে নিজেকে ক্ষয় করিয়াছিলেন। আকবরও মধ্যে মধ্যে অহিফেন ও সুরায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন কিন্তু কখনই তিনি নেশার দাস হন নাই। তাঁহার তিনটি পুত্রই মদ্যপ।

আহ্মদনগর অবরোধ করা হইল। চাঁদবিবি সেখানকার রাণী। তিনি আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। আকবরের উচ্চাভিলাষের প্রথম বলি দুর্গাবতীর মতই চাঁদবিবি ভারত ইতিহাসে দেদীপ্যমানা। চাঁদবিবি প্রান্তরে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন—ভারতীয় চিত্রকরদের ইহা অতি প্রিয় বিষয়। আক্রমণ এত ভাল ভাবে প্রতিহত হইল যে মুঘলদের রাজকীয় সম্মানের অনুপযুক্ত সর্তই মানিতে হইল। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। পর বৎসর মুরাদের স্থানে অন্য এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক করা হইল।

আকবর তখন লাহোরে। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের ব্যর্থতায় তিনি বেদনাদায়ক ভাবে মর্মাহত। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের অবাধ্য আচরণে আরো বিচলিত হইবার পর্ব এই শুরু

হইল। আরো গোলমাল চারিদিকে। তিন বৎসর ধরিয়া প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, তাহার পর প্লেগ সমগ্র উত্তর ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই দেশ দুর্ভিক্ষের আগমনের সঙ্গে এত পরিচিত এবং এই ব্যাপারে দেশবাসী এতই উদাসীন যে দেশীয় ঐতিহাসিকরা দুর্ভিক্ষের বর্ণনা নিতান্তই সাধারণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। রাস্তাগুলি মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, মানুষ মানুষের মাংস খাইতেছিল। সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপক প্রসারের তুলনায় তাহা নিতান্তই সামান্য। জেসুইটগণ ভাবিয়াছিলেন যে সম্রাট তাঁহাদের উপদেশ মন দিয়া পালন করেন নাই বলিয়াই এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা—ইহাই স্বর্গের বিচার। পথে পরিত্যক্ত শিশুদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারা সামান্য সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। জেসুইটরা তৃপ্তির সঙ্গে ইহাকে ঈশ্বরের ক্রোধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ইস্টারের দিনে লাহোরে আকবর যখন সূর্য-উৎসবে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় অকস্মাৎ প্রাসাদে আগুন লাগে। প্রাসাদের অনেকটাই, সমস্ত মূল্যবান আসবাব, রাজকোষ পুড়িয়া যায়। গলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্রোত পথে বহিয়া যায়।

যখন প্রাসাদ পুনরায় নির্মিত হইতে থাকে তখন আকবর জেরোমি জেভিয়ার ও তাঁহার এক সঙ্গীকে লইয়া কাশ্মীরে যান। জেসুইটগণ সেই পার্বত্য উপত্যকার আবহাওয়া, পুষ্পিত বৃক্ষরাজি ও তরু বীথিকা, তাহার ফলকুঞ্জ, নির্ঝরিণী, ও স্রোতস্বতী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। সমস্তই যাহাতে শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত না হয় সেজন্য সম্রাটের উপস্থিতি সেখানে বিশেষ প্রয়োজন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যুবরাজ মুরাদ প্রলাপ জ্বরে মারা যান। জুলাই মাসে আকবর যুবরাজ সেলিমের উপর আগ্রার ভার দিয়া দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। পরের বৎসর তিনি বুঢ়নপুর অধিকার করিলেন এবং রাজপুত্র দানিয়েলকে আহ্মদনগর আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। আহ্মদনগর এতদিন চাঁদবিবি দক্ষতা এবং সাহসিকতার সঙ্গে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অবরুদ্ধা নগবীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ শুরু হইল, এক উত্তেজিত জনতা চাঁদবিবিকে হত্যা করিল কিংবা হয়ত তাঁহাকে বিষপানে বাধ্য করিয়াছিল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্ট মাসে নগরী অধিকৃত হইল। এতদিন পর্যন্ত দানিয়ালের মধ্যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, আকবর ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকেই বিজিত দাক্ষিণাত্যের শাসক নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু মুবাদের মধ্যে একই প্রতিশ্রুতি দেখা দিয়াছিল, দানিয়ালও মুরাদের পথে চলিল। আর দাক্ষিণাত্য বিজয় এখনও শেষ হয় নাই।

খান্দেশ প্রদেশের ভরসার স্থল ছিল আসিরগড়ের বিরাট দুর্গ। আসিরগড় ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত এবং সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রথমে এই দুর্গটি অধিকার করা প্রয়োজন কারণ দাক্ষিণাত্য ও উত্তরভারতের সংযোজক পথটির উপর ইহার অধিকার। কিন্তু কী ভাবে? আসিরগড়ের প্রাকৃতিক শক্তিও বিপুল। সমতলভূমি হইতে নয়হাজার ফুট উপরে এক বিশাল পর্বত উঠিয়াছে। সেই পর্বতটি তিনটি দুর্গ শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। গিরিচূড়ার উপরে সমতলভূমি। সেখানে প্রায় ষাট একর প্রশস্ত কূপ এবং জলাশয়ের জল অফুরন্ত। সেখানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগৃহীত আছে তাহা একটি সৈন্যবাহিনীর দশ বৎসরের

উপযোগী। অবশ্য আবুলফজল লিখিয়াছেন—যুদ্ধে শেষ আক্রমণের সময় দুর্গদ্বার হইতে চৌত্রিশ হাজার সৈন্য বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং অবরোধকালে পঁচিশ সহস্র জন মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংখ্যাগুলি অবশ্য অতিরঞ্জিত। দুইটি স্থান ব্যতীত আসিরগড় একেবারে খাড়াপাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। কাজেই চিতোর আক্রমণের সময়, আকবর যে পথ নির্মাণকারীদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে তাহা কোন কাজে লাগিবে না। মুঘল সাঁজোয়াশক্তি দুর্বল, আর প্রতিপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের সংগ্রহ ছিল বিপুল। তাঁহাদের ছিল তের হাজার বন্দুক এবং গোলন্দাজদের অনেকে ছিল পর্তুগীজ।

এপ্রিল মাসে আবুলফজলের নেতৃত্বে এই অবরোধ শুরু হয়। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে প্রত্যক্ষ আক্রমণে সামান্যই ফল হইবে। আসিরগড়ে একটি বিশিষ্ট প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সেখানে সর্বদাই রাজবংশের সাতজন রাজপুত্র উপস্থিত থাকিবেন যাহাতে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে রাজ-কর্তব্যগ্রহণ করিতে পারেন। বর্তমান রাজার নাম ছিল বাহাদুর। খুবই আশ্চর্য যে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন একজন আবিসিনীয়। তিনি এখন বৃদ্ধ, অন্ধপ্রায় কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় ও তাঁহার মনোভাব বীরের মত। মে মাসে বাহাদুর অবরোধকারীদের নিকট চুক্তির সর্ত পাঠাইলেন কিন্তু সেই সর্ত তাহাদের মনঃপূত না হওয়াতে অস্বীকৃত হইল।

আসিরগড়ের পতন কাহিনী অনেকটাই অজানা। ইহার বিবরণ লিখিয়াছেন অবরোধের নায়ক আবুলফজল এবং জেস্যুইটদের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া দ্যু জারিক। জেরোমি জেভিয়ার এই অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলেন। খুবই স্বাভাবিক যে তাঁহার

বিবরণগুলিও ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু তবুও দুইটি বিবরণকে মিলাইয়া লওয়া অসম্ভব। ভিনসেণ্ট স্মিথ দ্যু জারিকের বিবরণ সর্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দ্যু জারিক-এর গ্রন্থের ইংরেজ সম্পাদক মিঃ পেইন্ দেখাইয়াছেন যে, ভিনসেণ্ট স্মিথ, আবুলফজল এবং অন্যান্য দেশীয় ঐতিহাসিকদের প্রতি মিথ্যা বর্ণনার যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা বহুলাংশে ভিত্তিহীন। সত্যই কী মহামারীতে আসিরগড়-রক্ষাকারীদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি মারা গিয়াছিল? দ্যু জারিক ইহার উল্লেখও করেন নাই, কিন্তু ইহার সমস্তটাই কল্পিত ইহা মনে করা যায় না। এই মহামারীর জন্যই হউক অথবা মূল প্রতিরক্ষাকারীদের নায়কেরা যে দুর্গে ছিলেন নভেম্বর মাসে তাহার অধিকারের ফলেই হউক বাহাদুর শাহ আবুল-ফজলের নিকট দূত পাঠান এবং আবুলফজল তাঁহাকে আকবরের নিকট প্রেরণ করেন। আরো আলোচনার জন্য সেই আবিসিনীয় সেনাধ্যক্ষের পুত্র মুবারত খান শিবিরে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন যে যদি দুর্গ এবং দেশ তাঁহারা বাহাদুরকে ফিরাইয়া দেন, বন্দীদের মুক্তি দেন তাহা হইলে বাহাদুর নতি স্বীকার করিবেন। সর্ত মঞ্জুর হইল। তাহার পর বাহাদুর আজিজ কোকাকে তাঁহার হাত ধরিয়া সম্রাটের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। বাহাদুর নীচে আসিয়া আকবরের সম্মুখে নত হইলেন। আকবরের হাতে পড়িবার পর তাঁহাকে আর ফিরাইয়া দেওয়া হইল না।

কিন্তু দুর্গ এখনও অধিকৃত হয় নাই। আবিসিয়ান বৃদ্ধ সেনাধ্যক্ষ নতি স্বীকারের কোন লক্ষণ দেখাইতেছেন না। আকবর অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। ওদিকে আগ্রায় যুবরাজ সেলিমের সম্বন্ধে যে সংবাদ আসিল তাহাতেও তিনি বিচলিত। এখন তাঁহার উত্তর-

ভারতে উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্তুগীজদের নিকট হইতে সাঁজোয়া পাওয়া যাইতে পারে কিনা এজন্য তিনি জেসুইটদের নিকট সংবাদ লইলেন। পর্তুগীজরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। ভারী কামানের অভাব দেখিয়া বাধ্য হইয়া আকবর উৎকোচের পথ গ্রহণ করিলেন। বিপুল উৎকোচের ফল ফলিল। প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনেককেই তাঁহার দলে টানিলেন। বৃথাই আবিসিনীয় বৃদ্ধ সকল রাজপুত্রকে একত্র করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়া পিতার সম্মান রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কেহ কোন কথা কহিল না। বৃদ্ধ চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর তোমাদিগকে নারী করেন নাই কেন"? ঠিক সেই সময়ে মুকাবর আকবরের শিবির হইতে এক প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভগবান করুন, তোমাদের মুখ যেন আমাকে দেখিতে না হয়। নীচে গিয়া বাহাদুরকে অনুসরণ কর।" গভীর লজ্জায় সেই যুবক শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া আবুল-ফজল ও অন্যান্য মুঘল সেনানায়কদের সম্মুখে উদরে ছুরিকাঘাত করিয়া মৃত্যু বরণ করিল। তাহার বৃদ্ধ পিতা দেখিলেন আর কোন আশা নাই। তিনি স্নান করিলেন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিলেন, ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিলেন, তাহার পর বিষপান করিলেন।

প্রতিরক্ষীগণ উৎকোচ পাইয়া দুর্গের দ্বার মুক্ত করিতে সম্মত হইল। কিন্তু তাহারা একটি সর্ত স্থির করিল। নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য তাহাদের এই কর্মের সমর্থন করিয়া বাহাদুরের একটি পত্র চাই। বাহাদুরকে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হইল। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের চাবি মুঘলদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

সৈন্যদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল না। খুবই কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে আকবর যখন শুনিলেন যে পর্তুগীজ গোলন্দাজগণ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বধর্মত্যাগী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। জেভিয়ার তাহাদের হইয়া সম্রাটের নিকট বলিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আসিরগড় অধিকৃত হইল। কিন্তু যে উপায়ে ইহা অধিকার করা হইল তাহাতে আকবরের গৌরব বাড়ে নাই। দাক্ষিণাত্য অধিকারের বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবিকই ব্যর্থতায় পরিণত হইল। তাঁহার বিজয়ী জীবনের কাল ফুরাইল।

১৫

আকবরের শেষ আশা দাক্ষিণাত্য বিজয় অসফল হইল; কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের জন্য আরো কঠিন আঘাত অপেক্ষা করিতেছিল। হৃদয়ের ভিতরে সেই আঘাত।

একটা সময় গিয়াছে যখন তাঁহার প্রথম যৌবনের সমস্ত সাফল্যও বৃথা মনে হইত—কোন সন্তান নাই, কোন উত্তরাধিকারী নাই। কী গভীরভাবে তিনি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কী আগ্রহের সঙ্গে সাধুর ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়াছেন, আর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন সত্যে পরিণত হইয়াছে তখন তিনি কী উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন! প্রথম সন্তান সেলিমকে কী ভালই না বাসিয়াছেন! তবু এই প্রিয় সন্তানই তাঁহাকে জীবনের নির্দয়তম আঘাত হানিল।

রাজপুত্র সেলিম দেখিতেছিলেন তাঁহার পিতা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া আছেন। তিনি কি কোনদিন সিংহাসনে বসিবেন না? তিনি ক্রমশই উদ্ধত ও অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিলেন। আকবর তাঁহার সন্তানের বিদ্রোহী মনোভাব জানিতেন। সেলিম তাঁহাকে বিষ দিতে পারে এরূপ সন্দেহও করিয়াছিলেন। তবু, সেলিম তাঁহার প্রিয়, সেই তাঁহার উত্তরাধিকারী। মুরাদ—মনসারেট-এর সেই মুখচোরা, বুদ্ধিমান ছাত্রটি, বাল্যাবস্থাতেই রণক্ষেত্রে কী শৌর্য দেখাইয়াছে—সে ধীরে ধীরে অপদার্থ মদ্যপে পরিণত হইল—আজ সে মৃত। কনিষ্ঠ সন্তান দানিয়াল। আকবর ভাবিয়াছিলেন সে হইবে বিজিত দাক্ষিণাত্যের শাসক—কিন্তু সর্বচেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকেও আটকানো গেল না। সেও এক পথে চলিতেছে, মদের তীব্র নেশায় উন্মাদ হইয়া যায়, যখন কোন উপায়েই মদ মেলে না

তখন সৈনিকদের বন্দুকের নলের মধ্যে ভরিয়া চুরি করিয়া মদ আনে। অসম্বন্ধ প্রলাপে তাঁহারও দিন শেষ হইয়া গেল। সেলিমও এই একই দোষে আসক্ত, তবে ইহা এখনও তাঁহার আয়ত্তে আছে। সে যে সমস্ত নির্দয় শাস্তি দেয় তাহা বর্বরের মত। তবুও ইচ্ছা করিলে সে সদয় হইতে পারে। তাহার যোগ্যতা আছে, অনুভূতি আছে, মানুষের ভালবাসা পাইতে পারে। এখন তাহার বয়স একত্রিশ। এখন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ।

আকবর তখনও দাক্ষিণাত্যে, সেলিম তাঁহার স্বাধীনতা দেখাইতে শুরু করিলেন। যদি আগ্রা অধিকার করা যায়, আর তাহার সেই বিপুল ধনরত্ন! মনের মধ্যে এই ভাবনার শিখা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, কিন্তু সাহস কুলাইল না। তিনি এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেলিমের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আগ্রা হইতে তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, এই পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু হায়, সেলিম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া এড়াইয়া গেলেন। এলাহাবাদে পৌঁছাইয়া তিনি সম্রাটের ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন, সমস্ত প্রদেশ দখল করিয়া তাঁহার অনুচরদের পুরস্কারস্বরূপ সমস্ত প্রদেশ অংশে অংশে বণ্টন করিয়া দিলেন।

আকবর দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র তিরিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া দ্রুত সংবাদ পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বাংলা ও উড়িষ্যার শাসক নিযুক্ত করিলেন। সেলিম এলাহাবাদে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি কমিল না। এক রাজা যেভাবে অন্য রাজার

সহিত সন্ধি করে তিনি সেইভাবে পিতার সঙ্গে আচরণ করিতে লাগিলেন এবং প্রচুর উদ্ধতদাবী করিলেন। এমন কি তিনি নিজের নামে মুদ্রা ছাপিতে আরম্ভ করিলেন আর পিতার ক্রোধ অধিক প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য তাঁহার নমুনা আকবরকে পাঠাইতে লাগিলেন।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। আবুলফজল তখন দাক্ষিণাত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সম্রাটের এক চিঠিতে তিনি যুবরাজের বিদ্রোহের কথা জানিলেন। আবুলফজল প্রত্যয়ের সহিত জানাইলেন যে তিনি বিদ্রোহীকে শীঘ্রই অবনত করিবেন এবং অবিলম্বে আগ্রা অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহাকে সবাই পথে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র লইলেন। পথে আবার একজন ফকির তাঁহাকে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সতর্ক থাকিতে বলিলেন। তবুও তিনি কোন দেহরক্ষী লইতে চাহিলেন না। আগস্ট মাসের প্রাতঃকালে তাঁহার ক্ষুদ্র দলটি যখন সেদিনের যাত্রার আয়োজন করিতেছে হঠাৎ পাঁচশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা চারিদিক বেষ্টন করিয়া আবুলফজলের সঙ্গীগণকে কিছুক্ষণের মধ্যে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে বর্শাবিদ্ধ করিল। তাঁহার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল।

বীরসিংহ এই হত্যাকারীদের নায়ক। তিনি যুবরাজ সেলিমের নিকট আবুলফজলের মস্তক পাঠাইয়া দিলেন। সেলিম এই দৃশ্যটি উপভোগ করিলেন। পিতার প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার বড় উল্লাস হইল। সেলিম এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বীরসিংহকে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার উপরে আবুলফজলের প্রভাব সেলিমের ভয়ের কারণ ছিল। তাঁহাব প্রতি আবুলফজল বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। কাজেই আবুলফজল যাহাতে রাজধানীতে আসিয়া পৌছিতে না পারে তাহার জন্য সেলিম এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন সম্রাট হন তখন এই কাজ সমর্থনও করিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার অদৃষ্টের পক্ষে শুভ হইয়াছে এই ভাবিয়া নিজেকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। গৃহমুখী আবুলফজলের পথের উপরেই যে বীরসিংহের জমিদারী ছিল ইহাকে তিনি "বিধাতার প্রসাদ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রিয়বন্ধু, রাজকার্যে তাঁহার দক্ষিণহস্ত, জেস্যুইট-দের ভাষায় "রাজার জোনাথন"—তাঁহার অবসান আকবরের পক্ষে বিরাট শোক; কিন্তু তাঁহার বন্ধু যে তাঁহারই পুত্রের ভাড়াকরা হত্যা-কারীর হাতে এমন ভাবে নৃশংস উপায়ে নিহত হইয়াছেন এ দুঃখ ভাষার অতীত। সম্রাটের ক্রোধ তাই তাঁহার দুঃখাপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। তিনদিন ধরিয়া একেবারে প্রথাবিরুদ্ধভাবে তিনি লোকচক্ষু হইতে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। বীরসিংহকে ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। বলিয়াছিলেন যে তাহাকে যেখানেই পাওয়া যাইবে যেন সেখানেই তাহাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু শিকার পলাইল। বীরসিংহ প্রায় ধরা পড়িয়াছিল, আহত-ও হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গোয়ালিয়ারে পলাইয়া গেল। আকবর বৃথাই ক্রোধে ফুঁসিতে লাগিলেন।

এখন তাঁহার বড় বেদনার সময়। সম্রাটের হৃদয় বড় তিক্ত, বড় বিক্ষত। একবার ভাবিলেন বিদ্রোহী পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাকে যথার্থ শিক্ষা দেন, আবার এই প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধ

হইতে বিরত থাকিতে চাহিলেন। গুজব রটিয়া গেল যে তিনি সেলিমকে রাজ্য না দিয়া তাঁহার সন্তান খসরু-কে উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অনেকেই ইহা সমর্থনও করিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন সেলিমের জননীর ভ্রাতা রাজা মানসিংহ। ইংরেজ টেরী তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, "খসরু অতি সুদর্শন পুরুষ" এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁহার পিতার স্বেচ্ছাচারিতা, নির্দয়তা এবং উদ্দাম অধৈর্যের তুলনায় তাঁহার যৌবনদীপ্ত সম্ভবনাময় জীবন উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হইতেছিল।

অবশেষে একটা মোটামুটি মিট্‌মাট্‌ হইল। আকবরের বাল্যাবস্থার রক্ষক বৈরামখানের স্ত্রী ছিলেন সালিমা বেগম। সালিমাকে আকবর পরে বিবাহ করেন। তিনি সেলিমকে নতি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করিতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। ১৬০৩ এর মার্চ-এপ্রিল মাসে সেলিম আগ্রা আসিতে রাজী হইলেন। সঙ্গে আসিবেন সালিমা। আকবরের মা-য়ের তখন প্রায় আশীবৎসর বয়স হইয়াছে। যুবরাজকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহাকে সালিমা বেগম রাজী করাইলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে আনিবার জন্য একদিনের পথ আগাইয়া গেলেন। তাঁহার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পিতাপুত্র মিলিত হইলেন। সেলিম পিতাকে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ এবং সাতশত সত্তরটি হস্তী উপহার দিলেন। আকবরের হৃদয় আর্দ্র হইল। হস্তীর প্রতি আকবরের সর্বদাই বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁহার মনোভাব সংযত করিয়া ভদ্রভাবে সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করিলেন, এমন কি তাঁহার উষ্ণীষ সেলিমের মাথায় পরাইয়া দিলেন। তরুণ খসরুর সমর্থকরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন কারণ এই

উষ্ণীষ পরাইয়া দেওয়ার অর্থই হইল সম্রাট কর্তৃক তাঁহার উত্তরাধিকারীর সমর্থনের প্রতীক।

কিন্তু দুইটি বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রচিত হইল তাহা খুব দৃঢ় নহে। তাঁহাদের মধ্যে আবুলফজলের রক্ত বহিতেছিল। আকবর সেলিমকে রাজপুতানায় একটি অভিযানে পাঠাইতে চাইলেন, কিন্তু সেলিমের সেরূপ ইচ্ছা ছিল না, তিনি শুধু আরও সৈন্য, আরো অর্থ চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতাপুত্রে বনিবনা হইল না। তিনি এলাহাবাদ ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। তখন তিনি ফতেপুর সিক্রিতেই ছিলেন। পিতার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ১৬০৩ এর নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ গিয়া তিনি আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করিলেন এবং স্বতন্ত্র দরবার বসাইলেন। সেলিম তাঁহার সমস্ত নৃশংসতা সত্ত্বেও এখন খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি দেখাইতে লাগিলেন, জেসুইট-দের প্রতি প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টি দিলেন। এবং দৃষ্টি এতবেশী দিলেন যে জেসুইটরা ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে শীঘ্রই ধর্মান্তরিত করা যাইবে। তিনি তাঁহাদের গীর্জার জন্য শিশু যীশুর একটি রৌপ্যমূর্তি উপহার দিয়াছিলেন। মনের ভিতরের কথা কে বলিতে পারে? বাহিরের দিক হইতে দেখিলে খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা সম্রাটের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাঁহার অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাঁহার স্ব-পক্ষে জেসুইটদের প্রভাব চাহিয়াছিলেন।

একদিন ফাদার জেভিয়ার দেখিয়াছিলেন যে সেলিম ময়ূরের পালক হইতে তাম্র নিষ্কাষণ করিবার মত অদ্ভুত কাজে ব্যস্ত। সেই তাম্র নাকি বিষের বিরোধী। বিষ তখন হাওয়ায় হাওয়ায়। আকবর সেলিমকে সন্দেহ করিতেন, সেলিম নিজপুত্র খসরুর

অনুচরদের সন্দেহ করিতেন। এই হীন অবিশ্বাস মহান মুঘলবংশের মধ্যে এক গভীরমূল কীটের মত প্রবেশ করিয়াছিল: পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতা। এই বেদনার চরম রূপ দেখি যখন আরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সন্দেহে রাজসভার পরিবেশ ভারী। সেই পরিবেশে এই বিরোধিতা চলিতে লাগিল এবং ক্রমশই গভীরতর হইল। চিন্তাক্লিষ্ট, তিক্ত আকবর সেলিমের অসাধু আচরণের কথা যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। জেসুইট-দের মতে তাঁহার সন্তানের রাজা উপাধি ধারণ চরম ঔদ্ধত্য—এবং তাহার ফলে আকবর এইবার সক্রিয় হইলেন। তিনি সেলিমকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পিতার সম্মুখে আসিলে তাঁহার হস্তে পড়িবেন এই ভয়ে এবং তাঁহাকে ডিঙাইয়া খসরুর রাজা হইবার গুজবের জন্য, সেলিম সম্রাটের আদেশের প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। আকবর এইবার প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন স্থির করিলেন। সেলিমও অন্যদিকে তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত মিলিয়া এক সমান সংখ্যক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। গৃহযুদ্ধ প্রায় আসন্ন।

রাজমাতা আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন। হামিদা, বহুকাল আগে সেই চতুর্দশী তন্বী সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমিতে পলাতক হুমায়ুনকে ঈষৎ অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন; আকবরের জীবনের সব কিছুর ভাগ লইয়াছেন, দেখিয়াছেন বিপদসঙ্কুল পরিবেশ হইতে সেই দুঃসাহসী বালক আজ এক শক্তিশালী মহান সম্রাটে পরিণত

হইয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয় পৌত্রটির প্রতি ঝুঁকিয়াছে। তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন সেলিমের সুযোগ কতটুকু। শত সংগ্রামজয়ী আকবরের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইয়াছে। তিনি আকবরকে সদয় হইতে অনুরোধ করিলেন, নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আকবর এখন হৃদয়কে কঠিন করিয়াছেন, তিনি শুনিলেন না। বৃদ্ধা দুঃখে অভিভূত হইলেন, তিনি বৃদ্ধা, দুর্বল, সংকটজনক ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সম্রাট তখন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার কাছে সেই সংবাদ গেল। প্রথমে আকবর ভাবিয়াছিলেন তাঁহার অসুস্থতা বুঝি ভানমাত্র, কিন্তু যখন সন্দেহাতীত ভাবে বোঝা গেল তখন আকবর বিষণ্নচিত্তে আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। যখন তিনি উপনীত হইলেন তখন তাঁহার মায়ের অসুখ আরো বাড়িয়াছে। কয়েকদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। হুমায়ুনের পার্শ্বে সমাধিস্থ করিবার জন্য দেহ দিল্লীতে আনা হইল।

আকবর তাঁহার মায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুদের মত মস্তক মুণ্ডন করিয়া শোকপালন করিলেন। এই দুঃসময়ে (১৬০৪) ইহাই তাঁহার একমাত্র শোক নয়। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র দানিয়াল পিতার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া অতি বেদনাদায়ক ভাবে এই বৎসরেই মারা গেলেন। দুঃখভারাক্রান্ত আকবরের আর যুদ্ধযাত্রায় মন ছিল না। তাই আবার কথাবার্তা শুরু হইল। রাজপুত্র যাহাতে বিনীত ভাবে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হন এজন্য একজন দক্ষ প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করা হইল। রাজা তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অবশেষে সেলিম নতি স্বীকারে সম্মত হইলেন। তাঁহার পুত্র

যদি তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইয়া যান এইরূপ ভয় তাঁহার মনে অবিরত জাগিতেছিল। তাই ভাবিলেন ইহাই তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ।

নভেম্বর মাসে তিনি আগ্রা পৌঁছিলেন। তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু নগর হইতে কিছুদূরে তাহাদের রাখিয়া আসিলেন। এবারও স্বর্ণ এবং হস্তী উপহার আনিয়াছিলেন তবে এবার হস্তীর সংখ্যা চারিশত। সম্রাট তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে 'কোন একটি সভাকক্ষ' বা বারান্দায় সংবর্ধনা করিলেন। সেলিম পিতার সম্মুখে দীনভাবে লুটাইয়া পড়িলেন। পিতাও তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন, তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরের একটি ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। আকবর হঠাৎ নিজের সংযম হারাইলেন। তাঁহার বহুদিন সঞ্চিত ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটিল। তিনি পুত্রের গালে চপেটাঘাত করিলেন, তাঁহার সমস্ত অসন্তানোচিত কুকার্যের কথা মনে করাইয়া দিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত প্রচণ্ড ছিল। তারপরই হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলাইয়া তিনি পুত্রকে নিরস্ত্র অবস্থায় বিনীত ভাবে আসিবার মত বোকামির জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। বিশেষত, তাঁহার নির্দেশ মাত্রই এখনি বিপুলসংখ্যক অশ্বারোহী আসিয়া পড়িবে। সেলিম নীরব, বাধ্য ; মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, অশ্রুভরা চোখে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

সেলিমের বন্দীত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃশ্যের অবসান হইল। তাঁহাকে 'কঠিনতম শাস্তি'—মদ ও অহিফেন দেওয়া বন্ধ করা হইল। রাজপুত্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার বোনেরা এবং আকবরের পত্নী আসিয়া পড়িলেন, অশ্রু ও

সহানুভূতিভরা চোখে তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। তাঁহারা একবার সেলিমের কাছে, একবার সম্রাটের কাছে যাইতে লাগিলেন। সেলিম অনুতপ্তচিত্ত এবং সমস্ত অপরাধের জন্য দুঃখবোধের এমন করুণ বর্ণনা দিতে লাগিলেন যে আকবরের হৃদয় কোমল হইল। ক্রোধ প্রকাশ করিবার পর হইতেই আকবরের মন তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য উৎসুক ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সেলিম মুক্তি পাইলেন এবং আবার সুরার মধ্যে মানসিক দৈন্যের শান্তি খুঁজিতে লাগিলেন।

তাঁহার আত্মম্ভরী সন্তান—তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিলেই কার্যে এবং কথায় এত ঔদ্ধত্য ও অসৌজন্য প্রকাশ করিত, তাঁহাকে এইভাবে অবনমিত হইতে বাধ্য করার মধ্যে আকবরের বিরাট ব্যক্তিত্বের অভূতপূর্ব বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়াছে। সেলিম তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় আর তাঁহাকে কোন কষ্ট দেন নাই।

আকবরের দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। আর মাত্র এক বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহময় এবং উচ্চাভিলাষী পুরুষ। আর দুইক্ষেত্রেই তিনি গভীর ভাবে আহত হইয়াছিলেন। আবুলফজলের হত্যা, সেলিমের বিদ্রোহ, জননীর মৃত্যু—সকলই তাঁহার হৃদয়কে দুঃখ ও ক্রোধে ক্ষত করিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত গৌরব ধূলায় মিশিল। তাঁহার দুইটি সন্তানের ঘৃণিত অকালমৃত্যু তাঁহার বহুকাললালিত আশা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, আর জ্যেষ্ঠ-পুত্রের যে চরিত্র তাহাতে যে বংশের ভবিষ্যৎ খুব শুভ তাহা মনে হয় না। তবে কি, শেষ পর্যন্ত তিনি সেলিমকে বাদ দিয়া পৌত্র খসরুকেই সম্রাট করিবেন? এই সময়ে আকবর ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না; কিন্তু যখন তাঁহার

চরম রোগ আরম্ভ হইল, সেই ১৬০৫ এর ২১শে সেপ্টেম্বর, সেই সময় তরুণ খসরুর দলবল দ্রুতবেগে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তাহারা স্থির করিল সেলিম যখন সম্রাটকে দেখিয়া জলপথে ফিরিয়া আসিবেন তখন তাঁহাকে বন্দী করিবে। তাঁহার নৌকা যখন দুর্গের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে তখন একজন তাঁহাকে এই বিপদের জন্য সতর্ক করিয়া দিল। সেলিম ষড়যন্ত্রকারীদের হাত হইতে পলায়ন করিলেন। বড় বড় ওমরাহ একত্র হইয়া উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে বসিলেন। সকলেই খসরুর দাবীর বিরোধিতা করিলেন। শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল।

সেলিম জানিতেন তাঁহার পিতা মহৎ তবুও পিতার মৃত্যু একান্তভাবেই কামনা করিয়াছিলেন। তিনি এখন সম্ভবত তাঁহার অতীতের কার্যকলাপের জন্য কিছুটা বেদনাবোধ করিতেছিলেন আর ভবিষ্যতের চিন্তায় অন্তরে অন্তরে ছিন্নভিন্ন হইতেছিলেন। তিনি একদিন সমস্ত রাত্রি অস্থিরতায় না ঘুমাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজধানীর পথে পথে এক উদ্বাস্তুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার শেষশয্যায় শায়িত হইবার বেশ কিছুকাল আগে হইতেই তিনি পিতার সম্মুখে যাইতে সাহস পাইতেন না ; হয়ত, তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল, তখনও পিতা-পুত্রের মাঝখানে অবিশ্বাসের মেঘরাশি।

আকবরের অসাধারণ সবল শারীরিক গঠন সত্ত্বেও, তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হইলেন। এখন ছোটখাটো অস্বস্তিতেও তাঁহার রোগ বাড়িত। তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার নিকটে লোকজনদের আসিতে দিতেন। বাইশে অক্টোবর শনিবার ফাদার জেভিয়ার এবং তাঁহার সঙ্গী জেস্যুইটগণকে আকবরের কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া

হইল। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন দেখিবেন মৃত্যুশয্যার দৃশ্য; পাপীর আত্মা কী যন্ত্রণা পায় সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ সম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন যে আকবর বেশ উৎফুল্ল এবং সভাসদদের সঙ্গে রসালাপ করিতেছেন। সোমবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল; তাঁহারা ঢুকিতে চাহিলে অনুমতি দেওয়া হইল না। আকবর মারা যাইতেছেন : তাঁহাদের সুযোগ হারাইয়া গেল।

যুবরাজ সেলিম ইতিমধ্যে ইসলামনির্দিষ্ট পথে চলিবার এবং খসরুর অনুচরদের শাস্তি না দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রধান অমাত্য-গণের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলেন। অবশেষে একদল প্রবল দেহরক্ষী লইয়া প্রাসাদে উপনীত হইলেন। পিতার সম্মুখে আসিয়া নত হইয়া কপাল ভূমিতে স্পর্শ করিলেন। আকবর তখন বাক্‌শক্তি হারাইয়াছেন। কিন্তু তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন; তিনি এখনও, মৃত্যুর প্রহরেও, চেতনা হারান নাই। তিমি ইঙ্গিতে বলিলেন যে পুত্রের মস্তকে তাঁহার রাজকীয় উষ্ণীষ পরাইয়া দিবেন, কোমরে হুমায়ুনের রাজকীয় তরবারী বাঁধিয়া দিবেন। তারপর কাজ শেষ হইলে, আবার একটি নীরব সংকেতে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সেলিম দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস লইলেন, উন্নতশিরে হাঁটিতে লাগিলেন, জনতার জয়ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, সিংহাসন সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

মুমূর্ষু রাজার নিকটে রহিলেন শুধু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহারা মহম্মদের ধর্মের কথা বারবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পূর্বপুরুষদের মহিমা ও তাঁহার শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু আকবরের ওষ্ঠ হইতে কোন স্বীকারোক্তি শোনা

গেল না। মধ্যে মধ্যে তিনি শুধু ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সাতাশে অক্টোবর প্রত্যূষে তিনি মারা গেলেন।

সুন্নীসম্প্রদায়ের প্রথানুসারে সমাধি অতি সরলভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। আকবরের নির্মিত দুর্গের রক্তপ্রস্তর প্রাচীরের কিছুটা অংশ ভাঙিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া আকবরের দেহ বহন করিয়া আনিলেন তাঁহার পুত্র সেলিম, ভাবীসম্রাট জাহাঙ্গীর! সঙ্গে চলিল একটি ক্ষুদ্র শবানুগমনকারী দল। তিন মাইল দূরে সমাধি নির্মিত হইয়াছে। যে অল্প কয়জন শোক-পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ধ্যাতেই তাঁহারা বেশ পরিবর্তন করিলেন।

জেসুইট পরিদর্শকের কাছে এই অতি দ্রুত এবং নিতান্ত সাধারণভাবে সমাধিস্থ করা অত্যন্ত কলঙ্কজনকরূপে অযোগ্য এবং উদাসীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহারা খ্রীষ্টীয়-রীতিতে যে আড়ম্বরের সঙ্গে মৃতদেহ বহন করা হয় তাহার সঙ্গে অভ্যস্ত; দেহ হইতে আত্মা যখন চলিয়া গিয়াছে তখন তাহাকে যে সম্মান দেওয়া হয়, সমস্ত জীবনেও সে সেই সম্মান পায় না। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন শবাধার স্থাপনের জন্য বিরাট যান, প্রজ্বলিত মোমবাতি, গম্ভীর সংগীত, শোক-পরিচ্ছদ, দীর্ঘ সুসজ্জিত শোভাযাত্রা, শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য শোকার্তের প্রার্থনা। তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই যে এত দীনভাবে একজন সম্রাটকে সমাধিস্থ করা উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে! তাঁহারা তাড়াতাড়ি একটি নীতিমূলক বাণী রচনা করিতে চাহিলেন। একজন লিখিলেন, "যাহাদের নিকট হইতে কোন ভাল কিছু পাইবার আশা নাই এবং খারাপ কিছুরও আশঙ্কা নাই তাহাদের প্রতি সংসার এইরূপ ব্যবহারই করে।" কিন্তু তাঁহারা জানিতেন

না যে ইসলামে একটি বিপরীত প্রথা আছে। পয়গম্বরের বাণী অনুসারে মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত কবরে লইয়া যাইবে। একজনের স্কন্ধ হইতে দুষ্ট-চরিত্রকে যত শীঘ্র নামাইয়া দেওয়া যায় তাহা যেমন ভাল, তেমনই পুণ্যাত্মাগণ যত দ্রুত শান্তি পাইতে পারেন তাহাও ভাল।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

বাংলায় প্রকাশিত পুস্তক তালিকা

১। ভারতের পুনর্গঠন (১৯৫৯ সালের প্যাটেল মেমোরিয়াল বক্তৃতা) —ডঃ জাকির হোসেন প্রণীত ও কৃষ্ণ ধর কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। মূল্য ১·০০

২। বীর বিদ্রোহী (শিবাজীর জীবনী)—বেনিস কিন্‌কেড কর্তৃক প্রণীত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯২। মূল্য ৫·২৫।

৩। অশোকের অনুশাসন—এন এ নিকাম ও রিচার্ড ম্যাকডন কর্তৃক প্রণীত। স্বত্ব—শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৮। মূল্য ২·২৫।

৪। বিজ্ঞান নয় অবোধ্যগামী—(বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও তার উন্নতি) —ডঃ রিচিক্যালভার। স্বত্বাধিকারী—প্রবোধকুমার মজুমদার। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৬। মূল্য ৫·০০।

একমাত্র পরিবেশক

জিজ্ঞাসা পাবলিশার্স

বুকসেলার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স

১৩৩-এ রাসবিহারী য়্যাভিনিউ, কলিকাতা

৫। মহাপরিনির্বাণের কথা (মৌলিক পালি থেকে অনূদিত)—সুকুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৬। মূল্য ১·২৫।

৬। বিজ্ঞানবিচিত্রা—ডঃ সি ভি রমণ কর্তৃক প্রণীত ও সুধাংশু চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৮। মূল্য ০·২৫।

৭। কল্‌কি : অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ—ডঃ এস রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক প্রণীত ও মীনাক্ষী দত্ত কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৬। মূল্য ০·৭৫।

৮। বঙ্কিমচন্দ্র · জীবন ও সাহিত্য—প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রণীত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২। মূল্য ০·৭৫।

৯। ভারত আজ ও আগামীকাল (আজাদ মেমোরিয়াল বক্তৃতামালা, ১৯৫৯) জহরলাল নেহেরু কর্তৃক প্রণীত ও অরুণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৬। মূল্য ০ ৭৫।

১০। জ্বালামুখী (উপন্যাস)—এ জি শোরে কর্তৃক প্রণীত ও সুকান্ত রায়চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত। মূল্য ২·৫০।

১১। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা—স্বামী জ্ঞানানন্দ ও অন্যান্য কর্তৃক প্রণীত ও মণীন্দ্র রায় কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২৪। মূল্য ৪·৫০।

একমাত্র পরিবেশক

দি পাবলিকেশনস ডিভিশান

ওল্ড সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী-৬

১২। অখণ্ড বিশ্ব ও ভারত (আজাদ স্মৃতি বক্তৃতামালা, ১৯৫০)—আর্নল্ড টয়েনবি কর্তৃক প্রণীত ও তরুণেন্দু ঘোষাল কর্তৃক অনূদিত। মূল্য ১০০।

১৩। মস্তক বিনিময় (দি ট্রান্সপোজড হেডস—এ লিজেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া) —টমাস মান কর্তৃক প্রণীত ও ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনূদিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৪। মূল্য—৪·০০।

একমাত্র পরিবেশক

মণীষা গ্রন্থালয় (প্রাইভেট) লিমিটেড

৪ ৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২